# সহবাস

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা - ৯

শ্রীবিমল কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একটা গোঙানির শব্দে রণেনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-জড়ানো চোখে দেখল চারদিক। কোথাও কিছু নেই। রাত নিশুতি, নিঃশব্দ। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে, হয়তো তার গুনগুন আওয়াজে ওর পাতলা ঘুম ভেঙে গেছে।

পাশ ফিরে শুল রণেন। এ-পাশটা ঘামে ভিজে গেছে। আশ্চর্য, শরীরের যে-পাশটায় পাখার হাওয়া লাগছে, সেটা কেমন ঠান্ডা, অথচ যে-দিকটায় বাতাস লাগছে না, সেদিকটা একেবারে ভেজা। পাশ ফিরতেই জানলাটা চোখে পড়ল ওর। পাতলা শাদা পর্দার ফাঁক দিয়ে একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীলচে কালো আকাশ। মৌরী বলে, বুড় রাত। অর্থাৎ ভোর!

মৌরীটা ওর ঠাকুমার পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই। কিছুদিন হল ওকে ও-ঘরে পাঠানো হয়েছে। চার বছর বয়স হয়ে যাবার পর কোন শিশুকে মা-বাবার কাছে শোয়াতে নেই : একটা আপ্তবাক্য যেন রণেনের মনে পড়ল। শিশু-মনস্তত্ত্বের কোনও বইতে পড়ে থাকবে। কেননা, ওই বয়স থেকে ওরা কিছু-কিছু বুঝতে শেখে। বাবা-মা'র সম্পর্ক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়। মা-বাবার ঝগড়ার দৃশ্য অবাক হয়ে দেখে। কখনও বা একজনের পক্ষ নিয়ে অপর-জনকে শাসন করে। রণেনের মন্দ লাগে না। কিছুই না বুঝে একজন ওর বা সোমার পক্ষ সমর্থন করছে এটা বেশ মজার, কোনও বন্ধুবান্ধবের কাছে যে-ব্যবহার আশা করা যায় না। বন্ধুরা যে উচিত-অনুচিত বুঝে, নিজেদের অ্যাটিচুড মতো, চুলচেরা বিচার করে। ওদের মধ্যে যে বিশ্বাসের সরলতা নেই।

বিশ্বাস আর সরলতা—এই দুটো দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ওর এলোমেলো ভাবনার মধ্যে এসে পড়ায় রণেন একটু অবাক। মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে চিত হয়ে শুয়ে রণেন ভাবতে থাকল, আচ্ছা, সরলতার রূপ কেমন? সরলতাকে যদি এঁকে বোঝাতে হয়, কেমন চেহারা হওয়া উচিত তার? সরলরেখার মতো : ও নিজেই একটা দার্শনিক উত্তর দিল। কী রকম সরলরেখা? যেমন রেললাইন? না, রেললাইনে কোন ডাইমেনশন নেই। লাইট পোস্টের মতো খাড়া? উঁচু? না, মনে ধরছে না ওটাও। অনেক ভেবে ও ঠিক করল, সরলতার চেহারা হওয়া উচিত এইরকম : ধরো, একটা সমতল ভূমি। তার বাঁ দিকে, নিচে একটা বিন্দু; ডান দিকে ওপরে আর একটা বিন্দু বসাও। দুটো বিন্দুকে জুড়ে দাও একটা সরলরেখা টেনে। রেখাটা সোজা ওপরের দিকে উঠে যাবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে টর্চ ফেললে যেমন হয় আর কি! সরলতা শুধু সোজা নয়, সরলতা অন্তরীক্ষভেদী।

আচ্ছা, বিশ্বাস? বিশ্বাসের চেহারাটা খুব জটিল নয়। গোল। জমির ওপর বসানো অর্ধবৃত্তাকার একটা ডোমের মতো। খানিকটা শিবঠাকুর টাইপ। তাহলে বিশ্বাসের সরলতা কী করে হয়? ভেবে ওর হাসি পেল এবার। দূর, কী সব অদ্ভুত চিন্তা ঢুকেছে মাথায়!

রণেনের মনে হল, মৌরীটা এই সময় কাছে থাকলে গোপনে ওর ঘুমন্ত মুখে একট চুমো খাওয়া যেত। গোপনে কেন? ভাবতেই আবার ওর হাসি পেল। নিজের চার বছরের মেয়েকে চুমো খাবে, গোপনে কেন? কার কাছে গোপন করবে! এত রাত্রে, বা নীল ভোরে, যখন কেউ ওদের দেখছে না! তার মানে, সোমাকে গোপন করার কথা ওর মনে হয়েছে! আশ্চর্য মানুষের মন! সোমা ওর স্ত্রী, সে পাশেই একটু দূরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—ওর দিকে ফিরে। ওর কাছে কবে কী গোপন করেছে—কখনও না। গোপন করার আছেই বা কী! কিছু নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বাদ দিলে। ঘটনা, না, কিছু নেই ওই একবার ছাড়া। সেটা খেলাচ্ছলে অবশ্য।

একটা পায়ের ওপর আর-একটা পা মুড়ে সোমা শুয়ে আছে। শাড়িটা একটু উঠে গেছে গোড়ালি থেকে। আরও একটু আলো থাকলে ওর জঙ্ঘার লোমগুলো দেখা যেত! বুকের ওপরেও শাড়ি নেই। পাতলা একটা মলমলের ব্লাউজ, স্তনদুটোকে ঢেকে রেখেছে। একটু যেন গড়িয়ে পড়েছে ওরা, স্বাভাবিকভাবেই। ও জানে, নীচে ব্রেসিয়ার নেই। রণেন ওই জিনিসটা একদম পছন্দ করে না। এমন কি, বহুদিন বলেছে, গরম কালের রাত, গায়ে কিছু না-ই দিলে। আমি ছাড়া কে দেখছে তোমায়! কিন্তু ওকে বোঝানো যাবে না। সংস্কার, অভ্যেস। তা ছাড়া, সব মেয়েরাই বোধহয় আলোকে ভয় পায়। আলো যেন আর-একটা পুরুষ। জানলা দিয়ে ঢুকে যদি চোখে পড়ে, একটি অর্ধনগ্ন যুবতী শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে, তাহলে হয়তো ওর কোনও কুকর্ম করতে ইচ্ছে হবে। আইনের ভাষায় যাকে বলে, শ্লীলতাহানি। রণেনের কৌতুক বোধ হচ্ছে। একে 'কুন্তী-কমপ্লেক্স' নাম দেওয়া যেতে পারে বোধহয়।

সোমার কাছে এগিয়ে গেল একটু। ওর ঘুমন্ত মুখটা দেখলে কেমন মায়া হয়। এমনিতে ছিপছিপে চেহারা ওর। রোগাটে, মুখটা কৌণিক। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে, বা সদ্য ঘুম থেকে উঠলে, একটু অন্যরকম দেখায়। ফোলা-ফোলা, মঙ্গোলীয়। যেন বাতাসের মতো কান দিয়ে ঘুম ঢুকে মুখটাকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিয়েছে। কান ধরে একটু নেড়ে দিলে ঘুমটা বেরিয়ে যাবে। আবার স্বাভাবিক হবে চেহারাটা।

সোমার কাছে সরে এল আরও রণেন। কানটা টেনে দেখবে নাকি? সোমার কান দুটো বড়ো। চেরা পানের মতো। পাটায় বসানো লাল পাথর-দেওয়া ফুল দেখে ইচ্ছে করল না। একটু নজর করে দেখল, ওর চোখের পাতা দুটো একটু

ফাঁক হয়ে আছে যেন, আর মণিদুটো তরতর করে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরছে। এক-একবার ভ্রূ তুলছে, নামাচ্ছে, মুখ বিকৃত করছে। তার মানে সোমা এখন স্বপ্ন দেখতে বিষম ব্যস্ত। সুখের স্বপ্ন দেখছে, না দুঃখের? কে জানে! বেচারী স্বপ্নই দেখে। ওর সুখস্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায় না। স্ত্রীকে সুখী করার ক্ষমতা রণেনের নেই, যেন চেষ্টাও নেই।

একবার মনে হল, মেয়েটা কাছে শুলে ওর পক্ষে এই ধরনের সার্ভে করা সম্ভব হতো না। চার বছর বয়সের পরে বাচ্চারা বাবা-মা'র ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না। সন্দিহান হয়ে ওঠে। হয়তো একটু ভয়ই পায়। কিন্তু ভয় পাবে কেন? প্রণয়ের দৃশ্যে ভয়াবহ তো কিছু থাকার কথা না। যাক্, এখন তো ও নেই। সুতরাং বিনা দ্বিধায় ও এগিয়ে যেতে পারে।

সোমার কপালের ওপর কয়েকটা চুল এসে পড়েছে। হাত দিয়ে সেগুলো ওপরে সরিয়ে দিল। সিঁথির ওপর সরু সিঁদুরের দাগ। 'ওটা আমি', রণেন মনে মনে উচ্চারণ করল। প্রথমবার ও টের পায় নি। দ্বিতীয়বার কপালে হাত ছোঁয়াতে ও হঠাৎ জেগে উঠল—কে, কে?

—কে আবার। ভূত! স্বপ্নে তুমি যার সঙ্গে আছ।

সোমা যেন জল থেকে ভেসে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে।—কী যে করো না! মুখটা একটু লজ্জিত-লজ্জিত করে আবার ডুব দিল ঘুমে।

তার এই হঠাৎ ভয় পাওয়া ভাবটা রণেনের মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছে হয়।

একটু-একটু আলো ফুটেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সোমার মুখ। আর ছুঁয়ে দেখার দরকার নেই। ও একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে ওর স্ত্রী। অথচ, ইচ্ছে করলে এখনই তো সে ওর গলাটা টিপে দিতে পারে। একটা পাতলা সোনার চেন দিয়ে ঘেরা জায়গাটা বেশ নরম, অরক্ষিত। টিপে দিলে, ঘুমের মধ্যে মরে যাবে, জানতেও পারবে না ব্যাপারটা কী হল। কোনও একটা মধুর স্বপ্ন দেখছে হয়তো এখন, স্বপ্নটা ফুরোবে না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

রণেন সরে এল একটু। কী সব উদ্ভট ভাবনা মাথায় জাগছে ওর। কেন ও সোমাকে খুন করবে! ও তো কোনও দোষ করে নি। অন্য কত লোকের বিরুদ্ধে ওর রাগ আছে, ঘেন্না আছে, অথচ তাদের খুন করতে তো ইচ্ছে হয় না। আর এ-বেচারী কী অসহায় ও নির্ভরশীল! ভীতু। হতেই পারে। ছোট-বেলাটা ওর যেভাবে কেটেছে!...

চাপা গোঙানির শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাশের বাড়ির সেই পাগলটা। লোকটা নাকি গানবাজনার লাইনে খুব নামজাদা ছিল এক সময়। ওস্তাদ। এখন পাগল হয়ে গেছে। শোনা যায়, কালা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ চোট খেয়ে। তারপর মাথাটা বিগড়ে যায়। দৃষ্টি আর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ছাড়া

ওর কোনও ইন্দ্রিয় আর কাজ করে না এখন। কী ছিল নিজে এক সময়, ওর মনে নেই। খিদে পেলে এক অদ্ভুত শব্দ করে তা প্রকাশ করে। মাঝে-মাঝে দুষ্টুমি করে, জিনিসপত্র ভাঙে-চোরে। আর সেইজন্যেই মার খায়। মার ছাড়া পাগলকে আর কী দিয়ে শাসন করা যায়। তবে, ভালো বলতে হবে, ওর ছেলেটা পারতপক্ষে বাপকে মারে না। হাজার হোক বাপ তো। এখন চেন দিয়ে বাঁধা। লোকে কত ভক্তি করত এক সময়ে। এখনও ওর শিষ্যরা কেউ কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে মাঝে-মাঝে। নেহাত দরকার পড়লে মায়ের হাতে ছড়িটা এগিয়ে দেয় ও। তারপর দূর থেকে দেখে, মা ওর বাবার পিঠে একটার পর একটা ঘা কষিয়ে দিচ্ছে, আর শাসন করছে—বলো, আর কোনও দিন এমন কাজ করবে?

বাপেরও প্রচণ্ড গোঁ। কিছুতেই হার মানবে না। রুখে উঠবে দু-একবার। তারপর চেন-এ টান পড়তেই বুঝবে এক সময়, ওঁর কোনও উপায় নেই। তখনও হাত দিয়ে, হাত উঁচু করে যতদূর সম্ভব বেতের ছড়িটা ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হবে না। বহুকাল ধরে যে-স্ত্রীলোক ওকে নিয়মিত শাসন করে যাচ্ছে, সে তো জন্তুটার কৌশলগুলোও জানে।

শেষকালে এক সময় পাগলটা জড়ানো গলায় গর্জন করে উঠবে, 'না। এ-বাড়িতে যে বাস করে সে গোমাংস খায়, সে খুনী।' তখন হয়তো ছেলেটার মায়া হবে। বলবে, এবার ছেড়ে দাও। অনেক হয়েছে মা।

তারপর পাগলটা শুয়ে পড়বে, গোঙাবে আরও খানিকক্ষণ। ঘুমিয়ে পড়বে। এবং তখন শুরু হবে পাগলের সাধ্বী বৌ-এর বিলাপ।—সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়ে খেলে। ওর মরণও হয় না। আমার পাপের ঘট পূর্ণ না করে ও তো মরবে না।

জানলার ফাঁক দিয়ে এইসব দৃশ্য রণেন বহুবার দেখেছে। প্রথম দিকে ওর আপত্তি জানাতে ইচ্ছে হতো। এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ জানাতে। তারপর নানান কথা ভেবে কিছুই করে নি, বলে নি। আমার বাবাও যদি এইরকম পাগল হয়ে উৎপাত করত, আমি কি প্রহার করতাম না? করতাম। সামাজিক মানুষ অভ্যেসের কোনও ব্যতিক্রম সইতে পারে না। আসলে, আমরা সবাই এক-একটা তারের ওপর দিয়ে হাঁটছি। ও তার থেকে পড়ে গেছে। আমরা পড়ি নি, এই যা তফাত।

আজ অবশ্য প্রহারটা একটু ভোর থেকেই শুরু হয়েছে, রণেন ভাবল। ঘুম ও আলস্যে-জড়ানো ওর কামনা আস্তে-আস্তে জেগে উঠছিল, পাগলটা বাদ সাধলো। দুনিয়ায় শান্তিতে বসবাস করার উপায় নেই, এই কথা ভেবে মনে-মনে হাসল। অবস্থাবিশেষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কী রকম পালটে যায়। পাশাপাশি তো দুটো বাড়ি। দশ ফুটের ব্যবধান। ও-বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর

হাতে মার খাচ্ছে, আর এ-বাড়িতে স্ত্রী স্বামীর কাছে আদর খাচ্ছে। ভাবাই যায় না। মানুষের সমাজ!

আস্তে-আস্তে বিছানায় উঠে বসল রণেন। পা টিপে-টিপে নামল। যে ঘুমোচ্ছে, সে ঘুমোক। ওর নিজের মেজাজটা তো খিঁচড়েই গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে বসল। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এখনও কাগজ আসতে দেরি আছে। ততক্ষণ এই দোতলার বারান্দা থেকে পাশের বাড়ির হালচাল আরও একটু দেখা যাক।

ওদের দরজার সামনে আলপনা আঁকা। দু পাশে দুটো ঘট বসানো হয়েছে। শাদা ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে দরজার চৌকাঠ। আজ তাহলে ও-বাড়িতে কোনও উৎসব-টুৎসব আছে, ও বুঝল। হয়তো পাগলটার জন্মদিন বা ওইরকম কিছু একটা হবে। তাই সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। এখুনি ভক্ত-টক্ত চেলা-চামুণ্ডা এসে পড়বে, তার আগে পাগল বাবাকে সাজিয়ে রাখতে হবে তো! মালাটালা পরিয়ে প্রস্তুত না রাখলে প্রণামী পাওয়া যায়!

ক্রমশ ফরসা হয়ে গেল। একদল কাক কোথা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে; রেলিঙে, ইলেকট্রিকের তারে বসে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এ ওকে ডাকছে। উঁচু ছাদগুলো বেশ অবলীলায় টপকে যাওয়া-আসা করছে। কার্নিশের ওপর বসে একটা কাক আবার ঠোঁটে শান দিয়ে নিল চটপট। কোথায় যে এরা সারা-রাত লুকিয়ে থাকে, ঘুমোয়, কে জানে। অত গাছ তো কলকাতা শহরে নেই।

সামনের বাড়ির বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরলেন। হাফ প্যান্ট পরা, হাতে ছড়ি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। বেশ হনহন করে হাঁটেন। রণেন ভাবল, ওরও এবার মর্নিংওয়াক শুরু করে দেওয়া উচিত।

খানিকক্ষণ পর নীচে একটা সাইকেল এসে দাঁড়াল। পরিচিত হকার। কেরিয়ার থেকে একটা কাগজ খুলল। দড়ি দিয়ে বাঁধল গোল বাণ্ডিল। তারপর তাক করে ছুঁড়ে দিল ওপরে। কাগজটা এসে রণেনের পায়ের কাছে পড়তেই তুলে নিল ওটা। আগ্রহ সহকারে খুলল, যদি কোনও নতুন খবর থাকে। সত্যিকারের উত্তেজক খবর। বন্যা, নৌকাডুবি, ট্রেন-দুর্ঘটনা—এ-সব একঘেয়ে হয়ে গেছে। এমন কি নাম বাদ দিয়ে যে-সব ঘুষখোর ও চোর সরকারি কর্ম-চারীদের ধরা পড়ার খবর বেরোয়, সেগুলোও। খবর-কাগজগুলো সত্য ঘটনা চাপা দেওয়ার এক-একটা র‍্যাকেট—রণেনের মাঝে-মাঝে মনে হয়। আবার মনে হয়, সত্যি জিনিসটা কী, মহাপুরুষরাই বুঝিয়ে বলতে পারলেন না, তা, কাগজের রিপোর্টাররা—খবর যাদের খাদ্য—জানবে কেমন করে!

পা ঘষার শব্দ শুনে বুঝতে পারল রণেন, সোমা এসে দাঁড়িয়েছে। রেলিং ধরে ওর পাশেই। যদিও ওর মুখ ফেরানো। ও চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল।
—আসুন, আসুন, রানি-মা; রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়েছিল তো? ও জানে, ঘুম

থেকে ওঠার পর সোমা একদম রসিকতা পছন্দ করে না। বিশেষ করে রাতটা যদি নিরবচ্ছিন্ন ঘুম ওকে না দিয়ে থাকে। আজকের মতন।

সোমা ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, কখন উঠেছ?

—আজ একটু সকাল-সকাল। চোখ না ফিরিয়ে রণেন কাগজ ভাঁজ করে।

—কী করছ এখানে বসে? রণেনের মনোযোগ কাড়তে চাইল সোমা।

—কাগজ পড়ছি দেখতেই পাচ্ছ। আর পাগলাবাবার সাজগোজ দেখছি। ওর গোঙানির শব্দেই ঘুমটা ভাঙল।

একটু আগে ছোঁড়া চাকরটা দুধ নিয়ে এসেছে। সোমা ভিতরে গিয়ে দু কাপ চা নিয়ে বাইরে এল আবার।

রণেন হাত বাড়িয়ে নিল তার কাপটা।

এখন সকাল সাতটা হবে। ভাবতেই মনে পড়ল, সেই গ্রামোফোন ও ঘড়ি-কেনার লোকটা এখুনি চেঁচাতে-চেঁচাতে ঢুকবে এ-দিকটায়। 'ক্লক, টাইমপীস, রিস্টওয়াচ বিক্রী আছে? গ্রামোফোন, ঘড়ি? ভাঙা ঘড়ি বিক্রী আছে?' এত ঘড়ি ও গ্রামোফোন রোজ-রোজ কে-ই বা বেচে! পাড়ার কেউ কি ওকে একদিনও ডেকে দাঁড় করিয়েছে? করে নি। লোকটা এই করে কি সংসার চালায়? না আরও কোনও ধান্দা আছে? কে জানে! নিজের মনেই একটা মজা তৈরী করার চেষ্টা করে রণেন। আচ্ছা, হঠাৎ একদিন ও যদি হাঁক দিয়ে ডাকে, 'হেলিকপটার, ইলেকট্রনিক কমপিউটার বিক্রী আছে? ভাঙা-চোরা জং-ধরা হেলিকপটার?' তখনও কি এই সব সারবন্দি বাড়ির লোকেরা নিস্পৃহ থাকবে? ছুটে বেরিয়ে আসবে না?

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে সোমা দেখল, বাঁক ঘুরে একটা রিক্‌শা এই রাস্তাটাতে ঢুকছে।

—এত ভোরে রিক্‌শা করে কে আসছে গো? রণেনের গায়ে হাত দিয়ে সোমা জিগ্যেস করল।

অর্ধমনস্কভাবে একবার কাগজ থেকে চোখ তুলে চাইল রণেন। দেখল, আর কেউ নয়, অনু। কোলের ওপর রাখা একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। নীল শাড়ি পরনে। পায়ের কাছে একটা ছোট সুটকেস।

রিক্‌শাটা বাড়ির সামনে নামিয়ে দাঁড় করাল; ব্যাগ থেকে খুচরো পয়সা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিল অনু।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা খোলা পেয়ে অনু সোজা বারান্দায় চলে এসেছে সুটকেস হাতে নিয়ে। দাদা-বৌদিকে সামনে দেখে একটুও চমকাল না। খুব গ্রাহ্য করল না, বলতে গেলে। জিগ্যেস করল, মা কোথায়?

—কী ব্যাপার, এত সকালে তুই? রণেন জিগ্যেস করল।

—মা কোথায়? এবারও অনু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করল। এবং

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব না পেয়ে ভেতরে চলে গেল সোজা, প্রমীলা যে-ঘরে শোন মৌরীকে নিয়ে।

সোমা ও রণেন দুজনে পরস্পরের দিকে চাইল—ব্যাপার কী?

অনেক আগেই প্রমীলা উঠেছেন। স্নান, পুজো সেরে মৌরীকে ঘুম থেকে তুলেছেন। নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসেছেন, মৌরীর হাতে দুটো বিস্কুট। ঘুম-চোখে একটু-একটু চিবোচ্ছে।

পর্দা ঠেলে অনু ঘরে ঢুকল। মা বললেন, কী রে!

অনু দেয়ালের পাশে এক কোণে নামিয়ে রাখল সুটকেসটা। ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বার করে মুখ মুছল। তারপর ছোট্ট করে জবাব দিল, চলে এলাম।

একটু চুপ করে থেকে রণেন আবার সোমার দিকে চেয়ে বলল, ব্যাপারটা একটু গন্ডগোলের ঠেকছে না? তুমি বরং ভেতরে গিয়ে সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা কর তো।

শুনে সোমা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ, তোমাদের বাড়ির ব্যাপার, তাতে আমি কেন নাক গলাতে যাব?

ঠিকই বলেছে বুঝেও রণেন ছাড়ল না। কাগজগুলো আস্তে-আস্তে ভাঁজ করে পাশে রাখল। তারপর নিরুত্তেজ গলায় বলল, তুমি তো আর আমাদের পরিবারের বাইরের লোক নও। ওর যদি কিছু ভালো-মন্দ হয়ে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব তোমাকেও তো নিতে হবে।

এইরকম ভাব-ভঙ্গি দেখলে সোমার মাথা গরম হয়ে যায়। নিজে পিছনে থেকে ওকে উসকে দেওয়া কেন? নিজেই গিয়ে খোঁজ নাও না! বলল, তুমি নিলে আমিও নেব দায়িত্ব। স্বাভাবিকভাবেই। তবে, এ-সব ব্যাপারে আমার নিজের কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

বেশ স্থির গলায় কথাগুলো সোমা বলে ফেলল।—আসলে তোমার বোনটি টেঁটিয়া, ওর সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না।

টেঁটিয়া কথাটা অশ্লীল, অপমানকর। ও আর কথা বাড়াল না। সত্যিই তো, সমস্যা যদি কিছু গজিয়ে থাকে, আর কেউ মাথা পেতে নেবে না। ওরই ঘাড়ে পড়বে। সামলাতে হবে একজনকেই। বাকি সবাই সেই সময়ে প্রত্যাশাভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে। এর নাম সংসার। ওর হঠাৎ মনে হল, দস্যু রত্নাকরের মতো চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আমার পাপ-পুণ্যে, দায়-দায়িত্বে যদি ভাগীদার হতে না চাও, তবে তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। সব স্বার্থপর। সুখের পায়রা, দুঃখের কাক।' ভেতরে ভেতরে রণেন উত্তেজিত বোধ করে।

সোমা ভেতরে চলে গেছে। মেয়েকে স্নান করিয়েছে। চুলে লাল রিবন বেঁধে দিয়েছে। তারপর বই-খাতার থলেটা এবং টিফিনের বাক্স নিয়ে ওর স্কুলে পৌঁছে দিতে বেরিয়ে গেল। কোনও আগ্রহ দেখাল না। রণেন ওর চলে যাওয়াটা দেখল। ওকেও উঠতে হয় এবার। ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে না বেরোলে শেয়ার-ট্যাক্সি পাবে না। পেলেও সাড়ে-ন'টার মধ্যে আপিসে পৌঁছতে পারবে না।

উঠে পড়ার আগে আড়মোড়া ভাঙছে, প্রমীলা বেরিয়ে এলেন। একা; অনু ঘরের ভেতরেই আছে তার মানে। মায়ের চোখ দুটো ভিজে। রেলিঙে ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে বললেন, শুনলি তো, অনুটা চলে এসেছে।

—কেন, কী ব্যাপার? রণেন বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল। যেন ও প্রস্তুত হয়েই ছিল।

—কী আবার ব্যাপার! শ্বশুরবাড়িতে ও থাকতে পারছে না।

মেয়েদের কান্নাকাটিকে প্রশ্রয় দিলেই বেড়ে যায়, অথচ পুরো ঘটনাটা তো শুনতেই হবে। না শুনে নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং, খবর-কাগজটা রণেন তুলে নিল আবার। ওলটাতে-ওলটাতে গম্ভীরভাবে বলল—না থাকলে কোথায় যাবে?

—যেখানে ওর একটা আশ্রয় জুটবে। প্রমীলা কান্না চাপলেন।—প্রথমে মায়ের কথা মনে হয়েছে। জানে না, মা-ও তো পরাধীন।

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে প্রমীলার গলা কাঁপল।

তাতে রণেন আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। সকাল থেকে মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। তার ওপর হঠাৎ একটা উড়ো খই! খবরকাগজ থেকে চোখ তুলে এবার বলল, কী হয়েছে খুলেই বল না। শুধু-শুধু কাঁদলে কী হবে!

প্রমীলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, ওদের বাড়িতে সবাই চামার।

তারপর সুতোর জট ছাড়াতে-ছাড়াতে যা বেরুল তা এইরকম : সুবীর —অনুর স্বামী—মদ্যপান করে। ও নাকি মাঝে-মাঝে বেশী রাত করে বাড়ি ফেরে। তখন ওর গায়ে অদ্ভুত ধরনের প্রসাধনের গন্ধ পাওয়া যায়। কোথায় ছিল, কেন দেরি করল, জিগ্যেস করলে ও ঝাঁজিয়ে ওঠে। অকারণ অনুকে অগ্রাহ্য করে, কষ্ট দেয়।

আর ওর দেওরটা নিজের ধান্দায় থাকে। বাড়িতে কে বাঁচল, কে মরল, ভ্রূক্ষেপ নেই।

যেন রণেনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উত্তরে প্রমীলা চোখ মুছতে-মুছতে বললেন, মেয়েমানুষ হলে বুঝতিস খোকা, কোথায় লাগে।

রণেন চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। কিন্তু সায় দেয় না। বিচারকের আসনে বসে ওর মনে হয়, অনুটারও নিশ্চিত কোনও দোষ বা ত্রুটি আছে। নইলে একজন পুরুষমানুষ সারাদিন কাজকর্ম করার পর পরিবার নামে একটা সুবিধেজনক ব্যবস্থা ছেড়ে কেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে? একপক্ষের কথা শুনে মামলায় রায় দেওয়া উচিত নয়।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভেবে-চিন্তে মা বলতে লাগলেন. কিছুদিন থেকে অনুর টানটা একটু বেড়েছে। বেশীর ভাগ রাত বেচারীকে বসে কাটাতে হয়। সুবীরকে বলেছে, একটা ডাক্তার দেখাও। কথায় কান দেয় নি ও। বলেছে, কী লাভ! এ তো তোমার ক্রনিক অসুখ। কোনও দিন কি সারবে?

বলেছে, তোমার মা আর দাদা অসুখটা গোপন করে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছে। যাতে চিরকাল আমাকে এই বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়।

রণেন যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠছে কিনা, একবার আড় চোখে লক্ষ করে প্রমীলা বললেন, সুবীর নাকি বলেছে : ভেবেছিলাম একটা ছেলেপুলে হলে হয়তো তোমার অসুখটা সেরেও যেতে পারে। এমন তো হয়। তা, এখন পরিষ্কার জানা গেছে, তোমার সে-ক্ষমতাও নেই। এই সব।

প্রমীলা শেষ কথাটা বলতে গিয়ে এবার কেঁদে ফেললেন।—কাল রাত্তিরে ফিরে সুবীর দেখে, অনু তখনও ঘুমোয় নি। কেন সুবীরের এত দেরি হচ্ছে, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি তো, এইসব নানান কথা ভেবে নাকি ওর শ্বাসকষ্টও বেড়ে গিয়েছিল। সমস্ত দৃশ্যটা দেখে সুবীর নাকি চিৎকার করে বলে ওঠে—তোমার মতন একটা মেয়েমানুষকে দিয়ে আমার কোনো কাজ চলবে না। বিয়ে করেছি নিজে জীবন ভোগ করব বলে। সেবা করার জন্যে নয়। গলায় শেকলের মতো তুমি চিরকাল ঝুলে থাকবে, এ আমি সহ্য করব না।

এরপর কান্না চাপবার চেষ্টা না করেই চালিয়ে গেলেন—এত আস্পর্ধা, বলে কিনা—হয় তুমি তাড়াতাড়ি মরার ব্যবস্থা করো, নয়তো বাপের বাড়ি বিদেয় হও। আমার হাড় জ্বালিয়ে তোমার কোন লাভ নেই। আর আমার নিজেরও অত সময় বা ধৈর্য নেই যে, তোমাকে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে হোমিওপ্যাথি-কবিরাজী করিয়ে বেড়াব।

ভাবতে পারিস খোকা, মা বর্ণনা শেষ করে মন্তব্য করলেন, চামার না হলে কেউ বলতে পারে, যদি বিষ চাও আমি যোগাড় করে নিয়ে আসব। অমানুষ না হলে কেউ এ-কথা উচ্চারণ করতে পারে? তুই বল্, এইরকম স্বামীর ঘর করা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

রণেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জবাব দিল, কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। আমায় একটু ভাবতে দাও।

কথাটা বলে ভাঁজ-করা কাগজটা শব্দ করে ফেলে দিল বারান্দায়। উঠে পড়তে চাইল। আপিসের সময় হয়ে আসছে। অকারণ দেরি করার মানে হয় না। সোমা এখনও ফিরল না। ওর জামা-কাপড়, আপিস যাওয়ার পোশাক বার করে দেবে তো। হয়তো দুর্লক্ষণ বুঝে কেটে পড়েছে, দেরি করে ফিরবে। তা বলে, ও তো সেজন্যে বসে থাকতে পরবে না। বলল, তুমি ঘরে যাও, আমার খাবার যোগাড় করো। কী করা যায় আমি ভেবে দেখি। যত সব ঝঞ্ঝাট!

ভেতরে যেতে-যেতে একটু আশ্বস্ত করল মাকে—আপিসে গিয়ে ডাক্তারকে একটা টেলিফোন করে দেবো। একবার অনুটাকে দেখে যাক। কী এমন রোগ যে সংসার ভেঙে যাচ্ছে?

নিজের ঘরে ঢুকল রণেন। তোয়ালে, জামা-কাপড় খুঁজতে লাগল। কিছুই

হাতের কাছে নেই। ভেতর থেকে ডেকে উঠল, আমার তোয়ালে কোথায়? মা, আমার গেঞ্জি?

সোমা আসার পর এ-সব কাজ প্রমীলা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সোমাই করে। মনে আছে, হাতে-হাতে সব জুগিয়ে না দিলে খোকা কী তুমুল কাণ্ডটাই না বাধাত একসময়। এখনও চোখে অন্ধকার দেখে, তবে বউয়ের কাছে হাঁকডাক একটু কম।

সন্ত্রস্ত হয়ে প্রমীলা এগিয়ে এলেন—এই তো তোর তোয়ালে। তুই বাথ-রুমে যা, আমি সব খুঁজে রাখছি।

কাঁধে তোয়ালেটা ফেলে রণেন বাথরুমে ঢুকল। দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে একেবারে বেরুবে। সচরাচর ও তেল মাখে না মাথায়, আজ প্রথমেই একটু নারকেল তেল মেখে নিল। চুলগুলো বড়ো রুক্ষ দেখাচ্ছিল।

কোন্ মেয়েটার শরীরে একটা না একটা অসুখ নেই, দাড়ি কামাতে কামাতে রণেন ভাবল। বিশেষ করে সেই বয়সটায় যখন বাচ্চা-কাচ্চা হবার সময়। তা না হলে, কলকাতা শহরে এত গাইনোকলজিস্ট, এত মেয়েদের ডাক্তার জুটলো কোত্থেকে। সবাই মিলে শরীরের একটা অঙ্গেরই চিকিৎসা করছে, করতে ব্যস্ত। আর বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যকৃৎ, ফুসফুস, নাক, চোখ, মাথা, হৃৎপিণ্ড—চুলোয় যাক।

অনু ওর বোন, ছোট বোন। বিয়ে হয়েছে মনোহরপুকুরে। এখান থেকে মাইলখানেক দূরেই ওর শ্বশুরবাড়ি। বছর তিনেক আগে যখন ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন এই কাছাকাছি ব্যাপারটা মায়ের খুব পছন্দসই হয়েছিল। পরের ঘরে যাচ্ছে, তবে দূরে যাচ্ছে না। ইচ্ছে হলেই দেখে আসতে পারবেন। তাই, পাত্রের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য একটু বেশী হওয়া সত্ত্বেও মা তেমন আপত্তি করেন নি। বলেছিলেন, আমার সঙ্গেও তোদের বাবার তো পনের বছরের তফাত ছিল। তখনকার দিনে এই রকমই চলত। আজকাল না হয় সমবয়সীদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার রেওয়াজ উঠেছে।

আসল কথা অবশ্য একটু অন্য রকম। অনু দেখতে খুব সুশ্রী নয়। সে তো অনেক মেয়েই হয় না। একটা বিশেষ বয়সে মেয়েদের এক ধরনের চটক আসে শরীরে। জলুস। এই পনের-ষোল থেকে চব্বিশ-পঁচিশ অবধি। সেই রকম সময়ে পাত্র হিসেবে সুবীরকে পাওয়া গেল। সবাই মিলে অনুকে পার করে দিল। ও আবার একটু রুগ্নও ছিল। একটুতেই সর্দি বসে যেত বুকে। রাত্রে ঘুমোতে পারত না। তাই মা ওকে দূরে পাঠাতে চান নি।

খেতে বসে রণেন প্রমীলাকে বলল, জানো মা, আমার একেক সময় মনে হয়, ওর বিয়েটা ভুল হয়ে গেছে। আজ তো প্রথম নয়। কয়েকবারই তো এই রকম অবস্থায় পেঁৗছেছে ওরা। তুমি গিয়ে একবার সালিশী করে এলে, মনে নেই?

খবরের কাগজ দেখে বিয়ে দেওয়া একেবারে লটারি খেলার মতো।...লেবু আছে?

—আছে, দিচ্ছি। প্রমীলা উঠে গেলেন রান্নাঘরে। একটু পরে লেবু কেটে এনে ওর পাতে দিলেন। বললেন, জানি না বাবা। আমাদের সময়ে তো এই রকম করেই সবায়ের বিয়ে হতো। সব ছারখার তো হয়ে নি...আর একটা মাছ নিবি?

—না।

—এইটুকু খেয়ে সারাদিন থাকিস কী করে তুই, বুঝি না। দেখিও না, জানতেও পারি না।

রণেন এ সব শুনছিল না। মূল প্রসঙ্গ তুলে ও বলতে চাইল, কিন্তু বলল না. এখন দিনকাল বদলে গেছে মা। ঠিকুজি-কুষ্ঠী না মিলিয়ে মেডিক্যাল রিপোর্ট মেলানো দরকার পাত্রপাত্রীর। চারদিকে যা ভেজাল, জ্যোতিষীর সাধ্য নেই তা ধরে।

প্রমীলা বলতে চাইলেন, কিন্তু বললেন না, তোমরা তো রয়েছ। খারাপ কী। ভাব-ভালোবাসা করে আজকাল যে ছেলেমেয়েদের বিয়ে হচ্ছে তাতে কী অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যাচ্ছে জানি না। অনেক তো দেখলাম।

রণেনের বন্ধু অভ্র, ও প্রেম করে সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছে। মা ওদের বিশেষ পছন্দ করেন না। ও'র ধারণা. ওরা কেমন ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু ধারণাটা একদম ভুল।

আপিসের দিকে রওনা হল রণেন।

না, ও ভোলে নি। ডাক্তারকে টেলিফোন করেছে একবার সুবিধে করে অনুকে দেখে যাবার জন্যে। এবং তারপর সুবীরকেও টেলিফোন করেছে : তোমার সঙ্গে কোথায় আজ দেখা হতে পারে, একটু জরুরী কথা আছে। সুবীর একটা চীনে রেস্তোরাঁর কথা বলেছিল। নিরিবিলি। রণেন রাজী হয় নি। সাধারণ একটা চায়ের দোকানে ওরা মীট করেছে সন্ধ্যেবেলা।

খুব বেশী পয়সা না। চার পাঁচ টাকা। তাও সুবীরই মিটিয়ে দিল। এবং ঘণ্টাখানেক বসে রণেনকে খানিকটা জ্ঞানও দিয়ে গেছে। ও চলে যাওয়ার পর রণেন চুপচাপ ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে, গাড়ি ও রাস্তার আলো দেখতে-দেখতে সমস্ত ব্যাপারটা হজম করার চেষ্টা করল। সুবীরের সাহস কত। বলে কি না, দাদা, ডিসপ্যাশনেটলি আলোচনা করা যাক। ম্যান টু ম্যান। ওর আবার একটু ইংরেজি বলার বাতিক।—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বেশ পছন্দও করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই ব্যাপারে আপনি আমার প্রতিপক্ষ হয়ে গেছেন। অনু আমার স্ত্রী, আপনার বোন।

রুগ্ন হওয়ার দরুন বা অন্য কোনও কারণে, যা সুবীর জানে না বলে প্রকাশ করল, অনুর কতকগুলো কমপ্লেক্স জন্মেছে। ওর পছন্দ-অপছন্দগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে ইদানীং। অথচ আমার সামনে, সুবীর বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, আমার সামনে একটা ভবিষ্যৎ আছে। এবং বাড়িতে বন্ধুবান্ধব কেউ এলে যদি স্ত্রীর কাছে অপমানিত হতে হয়, আমি নিজে কোনো পার্টিতে গেলে যদি শুনতে হয় ওদের জন্যে আমাদের পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হচ্ছে—কে পছন্দ করবে? বলুন, সহ্য করবে কে? কেউ তো রাস্তার ভিখিরি নয়। নিজের স্বার্থেই যাই, বা তাদের বাড়িতে ডেকে আনি। চিবিয়ে-চিবিয়ে সুবীর শুনিয়েছে—সোশ্যালি এবং সেক্শুয়ালি ফ্রাসট্রেটেড হলে, ক্রমাগত দিনের পর দিন, তখন কী করা যায় বলুন। ম্যান টু ম্যান, বলুন কী করা উচিত?

রণেন চুপ করে প্লেটের দিকে চেয়ে ছিল। যেন সে-ই আসামী। বাঁ হাতে কাঁটা দিয়ে কাটলেট বিঁধিয়ে সসে ঠেকাচ্ছিল বার বার।

—মাংসটা বাসী, না? ছোট দোকানে এই হল ঝঞ্ঝাট।—সুবীর প্রসঙ্গ বদলে জিগ্যেস করল, অন্য কিছু নিন। বেয়ারা—

—না, না, থাক। রণেন বাধা দেয়, আমার তেমন ক্ষিদে নেই।

নিজের প্লেটটা শেষ করে ছুরি-কাঁটা সোজা করে নামিয়ে রেখেছিল সুবীর বেশ কায়দাদুরস্তভাবে। রণেন লক্ষ করেছে। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে

কফির কাপটা এগিয়ে এনেছিল মুখের কাছে। এক চুমুক খেয়ে আবার শুরু করেছিল—আমি বুঝে গেছি শেষ পর্যন্ত, আমাদের একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব না। একটা সময়ে তো ডিসিশন নিতেই হয়, বলুন। এখনও খুব দেরি হয়ে যায় নি।

রণেন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রতিবাদ করে বলেছিল, তা বলে তুমি আমার ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিতে পার না। আমার নিজের ঢের সমস্যা আছে।

সুবীরের ধূর্ত, ফোলা-ফোলা চোখ দুটো যেন একটু নরম হয়েছিল এই কথা শুনে। কিন্তু কিছু বলে নি তখন।

—তার ওপর তোমাদের দাম্পত্য সমস্যার ভার যদি আমাকে বইতে হয়, রণেন জোর দিয়ে এবার বলতে চাইল—আমি বইব তুমি আশা করো, তবে একটু বেশী অবিচার করা হয়ে যায় না কি?

—তা কিন্তু আমি চাই না। একদম চাই না। মশলা চিবোতে-চিবোতে সুবীর রণেনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল—ঠিকঠাক মাসোহারা দেবো আমি, ডিভোর্স হয়ে গেলে যথোপযুক্ত অ্যালিমনি দিতেও আমি রাজী আছি। খেসারত দেবো ভুল মানুষকে বিয়ে করেছিলাম বলে।

বেয়ারাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়েছিল সুবীরই। ভাঙানির জন্য অপেক্ষা করছে।

রণেন বলল, আমার কাছে খুচরো ছিল সুবীর।

—ঠিক আছে। এরাই খুচরো দেবে।—সুবীর আবার শুরু করেছিল, তাছাড়া অনু তো গ্র্যাজুয়েট; সে-অহংকার ওর আছে। সেই জোরেই একটা চাকরি ও পেয়ে যেতে পারে। দরকার হলে আমি তারও চেষ্টা করে দেখব। আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকবে কেন!

রণেন বাধা দিয়ে বলেছিল, তুমি সমস্যাটা যত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে ভাবছ, ততটা সহজ নয়।

সুবীর ওর কথায় কান দিল না। বলেই চলল, যতদিন মা বেঁচে আছেন ততদিন সামাজিক লোকলজ্জার খাতিরে ওকে পেয়িং-গেস্টের মতো রাখুন। তারপর ওর একটা আলাদা ব্যবস্থা করে দেবেন। অনু রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয় খুঁজে বেড়ালে আমারও তো লজ্জা, আমারও তো অপমান। তা কেন হতে দেবো!

বেয়ারাটা খুচরো নিয়ে এসেছে। একটা টাকা টিপস্ দিল সুবীর। বেয়ারা বিদেয় হতে ছোট্ট করে রণেন বলেছিল, বুঝেছি। চলো ওঠা যাক।

—আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না দাদা। সুবীর দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কথাটা ছুঁড়ে দেয়।—আমার জীবন, আমার কেরিয়ার নষ্ট

হতে দিই কী করে বলুন, ফর দি সেক অফ এ ওয়াইফ! যখন আমি বেশ ভালো করে জানি, আর পাঁচ বছর ম্যাকসিমাম, আমার ডিরেক্টর হওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না। আমার সে যোগ্যতা আছে।

সুবীরের গাড়ি আছে, কিন্তু রণেন তাতে লিফট নেয় নি। আজ ভোরবেলা রিক্‌শা করে অনুর চলে আসার দৃশ্যটা ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না। বিষম অপমানিত বোধ করেছে। এক-একবার ওর মনে হয়েছে, বিয়ে জিনিসটাই একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। পুরনো ব্যবস্থা। এখনকার সময়ের সঙ্গে খাপ খায় না। মেয়ে-পুরুষ উভয়ের শিক্ষা, অর্থোপার্জন-ক্ষমতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ, তখন যৌথ পরিবারের মতো বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানেও ভাঙন ধরেছে।

প্রবল, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যেখানে সম্ভব হয় না, সেখানে দুজনের সংসারে সমান ভোটাধিকার থাকলে এক পা-ও এগোনো যাবে না। কাউকে তো ভেটো প্রয়োগ করতে হবে। কে করবে? কে প্রবলতর? পুরুষ, যে উপর্জন করে? না স্ত্রী, যে প্রতিপালন করে? বিরোধ হলে কার মত গ্রাহ্য হবে? পুরুষশাসিত সমাজ ভেঙে যেতে বসেছে—যাওয়াই উচিত, মনে-মনে ও স্বীকার করে না, তা নয়, কিন্তু অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থার এখনও জন্ম হয় নি। তাই এত অশান্তি।

সামনে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি। দুজন মেয়েপুরুষ নামল। লোকটির লম্বা জুলপি, গায়ে রংচঙে শার্ট, হলুদ পাৎলুন পরনে। মেয়েটি পরেছে লুঙ্গি এবং হাতকাটা ব্লাউজ। ট্যাক্সি থেকে নেমে মেয়েটি হাত দিয়ে চুল ঠিক করল।

রণেন এক পলকে ওর কামানো বাহু ও উদ্ধত স্তন দুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। হাতে হাত দিয়ে একটা শৌখিন রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়াল ওরা। মেয়েটি অকারণে হাসছে, হয়তো হাসলে ওকে সুন্দর দেখায় বলে। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা ওর চুল ঝালরের মতো দুলছে।

—গুরু! মনে-মনে এই একটাই শব্দ উচ্চারণ করে রণেন খালি ট্যাক্সিটাতে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, হাজরা ফাঁড়ি।

অভ্রর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, তখন ঘড়ি উলটে দেখে, সাড়ে আটটা। শেষ দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। রাস্তায় লোকজন এখনও কমে নি। তবে চলার গতি বেশীর ভাগই বাড়িমুখো। কয়েকটা ছেলে এদিক-ওদিক আড্ডা দিচ্ছে, তাদের কোনও তাড়া নেই। উত্তেজক দৃশ্যগুলো আজকের মতো শেষ-বার চেটে খাচ্ছে।

রণেনের একবার মনে হল, কোনও মেয়ের সঙ্গে যে কখনও বসবাস করে নি, সে-ই সবচেয়ে সুখী। রহস্যের প্রতি আকর্ষণ তার চোখ থেকে কখনও মোছে

না। এমন কি বুড়ো হলেও। যেমন সুশোভনবাবু—অভ্রর অকৃতদার জ্যেঠা-মশাই। জীবনটাকে আধখানা পেয়েই মশগুল।

বেল টিপতে তিনিই দরজা খুলে দিলেন।—আরে এসো রণেন। তারপর, কী খবর, অনেকদিন তোমার দেখা নেই। ভাবছিলাম, বাড়ির কারুর অসুখ-বিসুখ করে নি তো—

অসুখ-বিসুখ শুনে একটু সংকুচিত হল রণেন। কিন্তু সামলে নিল মনের ভাবটা। তা ছাড়া ও যে এ-বাড়িতে একটু বেশী ঘন-ঘন আসে সেটা অনেকেই লক্ষ করে থাকবে। উপলক্ষ অবশ্য অভ্র। ওর বন্ধু, অনেক দিনের বন্ধু। মিশুক, সচ্ছল, উদ্বেগহীন।

বসার ঘরটা বেশ ছিমছাম। সোফাসেট, সেণ্টার টেবিল। কোণে কিউরিও কেস। তার ওপর একটা লম্বাটে ফুলদানি। তাতে টাটকা তাজা রজনীগন্ধা। উজ্জয়িনীর ছোঁয়া আছে ঘরটায়।

ওকে বসিয়ে সুশোভনবাবুও বসলেন। পাখাটা জোর করে দিলেন। ওঁর হাতে একটা লম্বা চুরুট, মুখের কাছে অনেকটা ছাই জমে আছে। দেখে রণেনের অস্বস্তি লাগছিল। ইচ্ছে করছিল, গিয়ে ওটা অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে দিয়ে আসে। নইলে বাতাস লেগে ওটা এক্ষুনি ওঁর গায়ে পড়বে। তারপর ঝাড়াঝাড়ি, অকারণ ব্যস্ততা, কাপড় ও মেজে নোংরা।

পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসল রণেন। জিগ্যেস করল, অভ্র বাড়ি নেই?

—ও বম্বে গেছে কাল। হেড অফিসে কী সব মীটিংফিটিং আছে। সুশোভন কাঁচাপাকা চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন। ওটা ওঁর মুদ্রাদোষ।

রণেনের জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল, উজ্জয়িনী আছে? কিন্তু পাছে ভদ্র-লোক কিছু মনে করেন, তাই সংক্ষেপে জবাব দিল—ও।

সুশোভন একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলেন। উল্টে রেখে দিলেন সোফার একপাশে। আর যেন ওটার দরকার নেই, একটা জ্যান্ত মানুষ যখন পাওয়া গেছে; সময় কাটানোই যেখানে একমাত্র সমস্যা।

চুরুট খান বলে ওঁর হাতে সব সময় একটা লাইটার থাকে। ওটা জ্বালিয়ে নিবে যাওয়া জিনিসটা ধরালেন। তার আগে অস্বস্তিকর ছাইয়ের স্তূপটা ঝেড়ে নিয়েছেন অবশ্য। বললেন, বাজারের অবস্থাটা একবার লক্ষ করে দেখেছ?

—রোজই দেখছি। আচমকা প্রশ্নটা পেয়ে রণেন কিছু না ভেবেই বলে ফেলল প্রথমটা। বলে তারপর যোগ করল, আলু এক টাকা কিলো, সজনে ডাঁটা দশ পয়সায় একটা, পালংশাক চার আনা আঁটি। ভাবা যায়? তারপর

একটু থেমে, যেন অদ্ভুত কিছু একটা আবিষ্কার করার ভঙ্গিতে—তবু আমরা নির্বিবাদে তাই কিনছি, খাচ্ছি।

সুশোভন যেন শুনছিলেন না। একমনে নিবন্ত চুরুটটা আবার ধরাবার চেষ্টা করছিলেন।

ওই দৃশ্যটা সবচেয়ে বিরক্তিজনক। তবু কথা তো চালিয়ে যেতে হবে। এক সময় তো উজ্জয়িনী বেরুবেই। দেখা হবে। ওর সঙ্গে একবার দেখা না করে রণেন বাড়ি ফিরছে না।

—আর মাছ? রণেন কথা থামাল না। আট টাকা, দশ টাকা, বার টাকা কিলো। ভেবেছিলাম—সুশোভনের মন চুরুট থেকে সরিয়ে আনার জন্যে বেশ রসিয়ে বলল—ভেবেছিলাম, এবার বাংলাদেশের মাছ এসে পড়বে হুড়-মুড় করে। তা এখন দেখছি, ওদেরই যথেষ্ট খাদ্য নেই, আমাদের দেবে কী!

সুশোভন এতক্ষণে উত্তর দেবার মতো একটা শব্দ করলেন, হুঁ।

রণেনের জিদ চেপে গেছে তখন। তাই বলে চলল, যুদ্ধটা জিতিয়ে দিয়েছি বলে আমরা তো ওদের পেটে মারতে পারি না। বন্ধুভাবে যদি কিছু ইলিশ-টিলিশ—

—না, সে-বাজারের কথা বলছি না। অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে সুশোভন এবার বাধা দিলেন। শেয়ারবাজারের কথা বলছি; কী হাল হয়েছে!

—ও। রণেন ছোট্ট করে একটা আওয়াজ করল। এবার উনিই কথা বলুন।

সুশোভন বলে চললেন, জান, একটাকে আজ মনে হচ্ছে দারুণ ভাল শেয়ার, কাল দেখছি বসে পড়েছে। গ্রামোফোন কোম্পানীর দশ টাকার শেয়ার তখন কিনলাম না এই ভেবে যে, লোকে খেতে পাচ্ছে না, গান-বাজনা শুনবে? অথচ দেখ, কী তরতর করে দাম চড়ল। আবার, পঁচিশ টাকা দরে কিনলাম একশো শেয়ার।—চুপ করে চুরুট চিবোলেন খানিকক্ষণ। তারপর—এখন সাড়ে তেইশ। ঈল্‌ড্‌ সাড়ে সাত পার্সেণ্টেও নয়। না পারি রাখতে, না পারি ফেলতে।

যতক্ষণ চুরুটটা জ্বলছে ততক্ষণ উনিও কথা বলে যাবেন, রণেন জানে। সুতরাং ওর এখন ওই জিনিসটা কখন নিববে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই ওঁর দিকে চেয়ে ও অন্য কথা ভাবতে লাগল।

সুশোভন তাঁর প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান যখন শ্রোতা একজন পেয়েছেন। কাঁচা-পাকা চুলে আঙুল চালিয়ে বললেন : না হলে ওগুলো আন-লোড করে মার্টিন বার্ন নিতাম। সাত চুয়াল্লিশ দর যাচ্ছে। আবার ভয় করছে, যদি আরও নামে! তাহলে তো স্যার বীরেনের সঙ্গে আমিও ডুবব।

চুরুট নিবে যাবার ভয়ে বোধহয় মুখ বন্ধ করেই হাসলেন নিজের রসিকতায়। বললেন, লোহা, জানো রণেন, ঠেলে তুললে উদ্ধার, গলায় ঝুললে

ভরাডুবি।

'উদ্ধার'-এর মতো একটা তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ কীভাবে ব্যবহার করলেন! রণেন তাকিয়ে তাকিয়ে ওঁকে দেখছিল। হুঁ হাঁ কিছুই বলল না। মনে-মনে এবার ওঁর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবে ঠিক করল : এই বুড়ো বয়সে তোমার শেয়ারের টাকা কে খাবে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখনও টাকা, টাকা। ওর মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করছিল।

সুশোভন আবার ধরালেন চুরুট। বললেন, ভেবেছিলাম ঠিক সময়ে ব্লুক বন্ড ধরব...

—(তুমি কিছুই ধরতে পারবে না বাছাধন। চিরকাল দালালি করে কাটিয়ে দিলে। বুঝলে না, কত ধানে কত চাল!)

—কিন্তু ঊনত্রিশ টাকা দিয়ে ওই শেয়ার আমি কিনব না।

—(অতই যদি তোমার মনের জোর, তবে রমলা চৌধুরী নামে সেই ভদ্রমহিলাকে—বিধবা ভদ্রমহিলাকে—জড়িয়ে তোমার সম্বন্ধে যা শোনা যায়, তা কি আংশিকও সত্যি না?)...কোনো মানে হয় না।

উৎসাহিত হয়ে সুশোভন চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, আচ্ছা, নতুন যেগুলো ছাড়ছে আজকাল, তাদের কোনওটা দাঁড়াবে বলে মনে হয় তোমার?

—(কেউই দাঁড়ায় না। সময় হলে সবাই চলে যায়। অভ্রর মা, রমলা চৌধুরী যেভাবে চলে গেছে। তুমি তার জন্যে, তার মুখ চেয়ে এই বিরাট বাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলে, এখন তার ছেলে-বৌ তা ভোগ করছে। এখন তোমার উচিত—ভাবনাটা রণেনের ঠোঁটের গোড়ায় কথা হয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল, সামলে নিল—এখন তোমার উচিত, অকারণ বিষয়-আশয়ে জড়িয়ে না থেকে ভগবানের নাম করে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেওয়া। ঘরে-ঘর ঘুরঘুর করে তার গন্ধ না শুঁকলেও চলবে। সে তো আর ফিরবে না।)...বলা মুশকিল।

—আজকাল আমার আর কিছু ভাল লাগে না, জান। কোনও কিছুরই যখন স্থিরতা নেই। সুশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—(এতক্ষণে খাঁটি কথাটা বলেছ। কিছু ভাল লাগছে না, না? তা শুয়ে পড় গিয়ে। আর, ভেতরে গিয়ে উজ্জয়িনী দেবীকে পাঠিয়ে দেবে? এখানে বসে বেশী বোর কর না বুড়ো। না হলে আমি চিৎকার করে উঠব)...আমি তাহলে উঠি আজ।

—আরে সে কী! বোসো বোসো। এতদিন পরে এলে, একটু চা দিতে বলি। এবার সত্যি-সত্যি সুশোভন গাত্রোত্থান করলেন। তালতলার চটিতে ফট-ফট শব্দ করতে করতে ভেতরের দিকে গেলেন, কোথায় জয়ী, জয়ী মা—

সুশোভন ভেতরে গেলে পর রণেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিছুক্ষণ পরে উজ্জয়িনী ঘরে ঢুকল। আরে, আপনি কতক্ষণ?

—এই কিছুক্ষণ আর কি!

—বাথরুমে ছিলাম, টের পাই নি। বলে উজ্জয়িনী ওর সামনের সোফাটায় বসল, একেবারে মুখোমুখি।

কোনও মেয়ের মুখে "বাথরুমে ছিলাম" কথাটা বেশ অশ্লীল শোনায়। অর্থাৎ, মনে করিয়ে দেয় বাথরুমের ভেতরের দৃশ্যটা। কী করছিলে এতক্ষণ ধরে! ওর সুন্দর সুসজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে রণেনের একবার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। নিশ্চয় কোমডে বসেছিলে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিলে? শরীর পরিষ্কার করছিলে? না, এসব কথা ভাবা যতটা সহজ, বলা একদম তা নয়। হয়তো এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ, বুঝতে পারা যায়, কিন্তু মুখের ওপর প্রশ্ন করা যায় না। সেই পিকনিকের ঘটনা সত্ত্বেও। রুচি, রুচিতে বাধল রণেনের।

রণেন বলল, জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম।

—হঠাৎ কী মনে করে? দুষ্টুমিভরা চোখে জিগ্যেস করল উজ্জয়িনী।

—চলে এলাম, এমনি। কেন, এমনি আসতে নেই?

—আসেন না তো। উজ্জয়িনীর গলা যেন অনুযোগের মতো শোনাল।

প্রচণ্ড সাজগোজ করেছে উজ্জয়িনী। চুল বেঁধেছে বড় করে। কোমরের নিচে পরেছে শাড়িটা। একটু মোটাসোটা, তবে বাচ্চাকাচ্চা হয়নি তো, তাই পেটটা, নাভিটা দেখাতে ওর লজ্জা করে না। ওর অস্তিত্ব থেকে একটা অদ্ভুত সুগন্ধ বেরোচ্ছিল। ওটা কোনও প্রসাধনের না, একেবারেই ওর স্বকীয়, স্বতন্ত্র—রণেন নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল। জয়ীকে দেখলে বহুবারই ওর মনে হয়েছে, এই মেয়েটিকে পোজেস করা দরকার। একটা দুর্মূল্য সম্পত্তির মতো। যেন ওর মধ্যে আছে একটা রত্নের খনি, যা কেউ আবিষ্কার করে নি এখনও। অভ্রও না। যা একদিনে আবিষ্কার করা যায় না। তা না হলে ও কি বলতে পারত, জয়ীর ওপরটা চকচকে, জানিস, ভেতরটা একদম ফাঁকা।

—বেশ তাহলে উঠি। অভ্র যখন নেই—এবার রণেন ভেবেই বলল কথাটা।

জয়ী দমবার পাত্রী নয়। বলে, এক কাপ চা তো খেয়ে যান।

রণেন বলল, না, ভুলে এসে পড়েছি আর কি। উঠি।

—উঠে পড়লে আমি দরজা ধরে দাঁড়াতে পারব না। অশোভন। ওটা মানায় না আজকাল। তবে...

—তবে কী?

—তবে, ওঠার ইচ্ছে যদি খুব প্রবল না হয়ে থাকে, তাহলে একটা প্রস্তাব দিতে পারতাম।

রণেন গুছিয়ে বসল, একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মুখ তুলে বলল,

শুনি।

—জানেন, তৈরী হয়ে বেরুলাম, কিন্তু কিছু করার নেই। একটু পরে ক্রীম দিয়ে এগুলো তুলতে হবে।

—হুঁ। একটা শব্দ করল রণেন। কব্জি উলটে ঘড়িটা দেখল। ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করল, প্রস্তাবটা কী?

বেশ সপ্রতিভভাবে উজ্জয়িনী বলে, রাত্রের শোয়ে একটা সিনেমা দেখাবেন?

রণেনের মনে পড়ল, সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি। কিছু বলেও আসে নি। তবু প্রস্তাবটা ভালই লাগছে। এই হয়। বাড়িতে থাকলে বেরোবার আগ্রহ থাকে না। আবার একবার বেরিয়ে পড়লে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। বাড়ি—অভ্র যাকে বলে, হোল অফ এ হোম। বাড়ি নামক একটা গর্ত!

বলল, সময় কিন্তু খুব বেশী নেই। প্রায় নটা বাজে।

তারপর ওরা দুজনে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখতে বেরোল। একবারের জন্যে রণেন প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু জ্যেঠামশাই? তিনি কী ভাববেন?

জয়ী বলেছিল, হু কেয়ার্স!

উজ্জয়িনীকে পৌঁছে রণেন যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত প্রায় বারোটা। সোমা জেগে ছিল। কোনও কথা বলল না। রণেন ভেবেছিল, জিগ্যেস করবে, এত দেরি। কোথায় গিয়েছিলে? এবং উত্তরে ও বলবে, সুবীরের সঙ্গে কথা ছিল। সোমা কোনও প্রশ্ন না করাতে ও একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অথচ মেজাজ এমন টইটুম্বুর হয়ে আছে, নিজে থেকে গল্পটা বানাবার প্রবৃত্তি হল না ওর। সোজা গিয়ে ঢাকা-দেওয়া খাবার খেল। তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

শোবার সময় একবার ওর মনে হল, মৌরীটা পাশে থাকলে ভাল লাগত। স্ত্রীর মুখোমুখি, একা একটা ঘরে শুতে ওর কেমন অস্বস্তি হচ্ছে আজ। শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুমোবার ভান করে পড়ে রইল রণেন। কোনও কথা বলল না সোমার সঙ্গে। সোমাও ও-পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

রণেন সন্তর্পণে দুটো করতল জোড়া করে শুঁকল কয়েকবার। বাঁ হাতে জয়ীর খোঁপার গন্ধ, প্রসাধনের গন্ধ এখনও লেগে আছে। মন্ত্রের মতো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, আঃ শরীর, শরীর।

৪

অভ্র স্নান সেরে বেরোবার আগেই বাতিটা গেল নিবে। বাথরুমটা হঠাৎ কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। দরজার গায়ে লাগানো একটা আলনা গোছের, তাতে ঝুলছিল ওর পাজামা, তোয়ালে। দেয়াল ধরে ধরে ও পেঁাছল জায়গাটায়। সম্পূর্ণ আন্দাজে গা মুছল। লক্ষ করল, এত পরিচিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ অন্ধকারে ঠিক ঠিক ঠাহর করা যায় না সব সময়। আন্দাজগুলো আলোর সঙ্গে এমন জড়িয়ে আছে। একদিন হঠাৎ পৃথিবী থেকে যদি সূর্যের আলো সাপ্লাই কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়, অভ্র ভাবল, কী হবে! লোকগুলো অন্ধ হয়ে মরে যাবে?

ও-ঘর থেকে উজ্জয়িনী সাড়া দিল, সমস্ত পাড়াতেই আলো গেছে। মোমবাতি জ্বালিয়েছি, দেবো তোমাকে?

—দাও না। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বলল বটে, কিন্তু একটু মজা করার জন্যে বাথরুম থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে; খাটের একপাশে। জয়ীকে চমক দিতে হবে।

—এই এক উৎপাত হয়েছে রোজ! কথায় কথায় সাপ্লাই বন্ধ। গজগজ করতে করতে উজ্জয়িনী সাবধানে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল অভ্র : এইবার পেয়েছি। কতদিন পালিয়ে বেড়াবে খুকুমণি!

আচমকা ব্যাপারটায় আঁতকে উঠেছে জয়ী। হাত থেকে মোমবাতিটা গেল পড়ে। আঃ করে একটা ভয়ার্ত শব্দও বেরিয়েছিল বোধহয় গলা দিয়ে। তারপর সামলে নিয়েছে। সব মিলিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার জন্য একটু রেগে গেল।

—কী যে করো! মাথামুণ্ডু বুঝি না। ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

অভ্র ছাড়ল না প্রথমটা। ওর মজাটা চালিয়ে যাবার জন্যে বলল, কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না, ভয় কিসের? বলে একটা চুমো খেল ওর গালে। আস্তে-আস্তে বিছানার দিকে টানতে লাগল।

সব ব্যাপারটা প্রথম থেকেই কেমন স্থূল মনে হচ্ছিল উজ্জয়িনীর। হোক স্বামী, না থাক ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোনও জড়তা, কিন্তু একটা ডিসেন্সি থাকবে তো। ভদ্রলোক যখন। জ্যেঠামশায় না হয় বাড়ি নেই, চাকরটা আছে আশেপাশে। না, আসলে সেটাও বড় কথা নয়, উজ্জয়িনীর মনে হল, অভ্র ওকে কখনই সম্মান দিয়ে ব্যবহার করে না। যেন ও একটা খাবার জিনিস, যখন খুশি কামড় দিলেই হল। ও যে একটা মানুষ, ওর যে সময়-অসময় আছে, ওকেও

যে সব ব্যাপারে তৈরী হতে হয়, হওয়া দরকার, তা অভ্র কোনওদিন বুঝবে না। বোঝালেও মানবে না। এক এক সময় উদাসীন হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়, চেয়ে পর্যন্ত দেখে না, জয়ী, যাকে ও একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছিল, সে কী করছে, কী ভাবছে। ওর মন ভালো আছে কি নেই। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে স্ত্রীর প্রতি কোনও কর্তব্য আছে কি নেই, কোনওদিন চিন্তা করেছে? আবার এক একদিন পাগলামি চাপে মাথায়। অভ্র নিজেকে নিয়ে নিজেই মশগুল।

এই সব জমে-থাকা অভিমান জেগে ওঠার ফলে মনটা ওর বিষিয়ে উঠল কেমন। স্বামীর প্রস্তাবে সায় দিতে ইচ্ছে করল না। অন্ধকারের মধ্যেই হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল উজ্জয়িনী। এবং বেরোতে গিয়ে পড়ে গেল দরজায় ধাক্কা লেগে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। অভ্র বুঝতে পেরেছে ও পড়ে গেছে, তবু কী এক অদ্ভুত গ্লানি ছেয়ে গেল ওর মনে। ও ঘর থেকে বেরুল না। যাক ও যেখানে খুশি, মরুক গে। মনে-মনে উচ্চারণ করল কথাগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তার-পর, অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে-শুয়ে টের পাচ্ছে অভ্র, জয়ী অপেক্ষা করছে, নিজে থেকে দাঁড়িয়ে উঠছে না। ভাবছে ও এসে হাত ধরে টেনে তুলবে. জিগ্যেস করবে, লাগে নি তো? তারপর মনে হল. মৃদুস্বরে কাঁদছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল জয়ী। দেয়াল. দরজা. খাবার টেবিল ধরে ধরে ওদিকটায় চলে গেল। জ্বাললো আর একটা মোমবাতি। তারপর বাতিটা নিয়ে, যেভাবে ক্রীশ্চান বিধবারা স্বামীর কবরের দিকে যায়, ও চলে গেল বসার ঘরে দিকে।

যখন আলো জ্বলল আবার, ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে। আবহাওয়াটা কেমন তেতো হয়ে গেছে। অভ্রর ইচ্ছে হল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। একটু ঘুরে আসে কোথাও। কিছুক্ষণ ভেবে আবার সে ইচ্ছেটাকেও ছেড়ে দিল। কী রকম অবসন্ন লাগছে।

কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ। তারপর সে নিজেই কথা বলল প্রথম, লেগেছে তোমার?

জবাব নেই।

—অমন ছুটে পালাবার কী হয়েছিল? আমি কি তোমায় খেয়ে ফেলতাম?

জবাব নেই। অভিমানে ফুলে উঠেছে জয়ী। কিন্তু কিছুতেই অভ্র আরও নীচু, বিনীত হতে পারল না। যেটুকু সহানুভূতি ওর মনে জেগে উঠেছিল. তাও গিলে নামিয়ে দিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল. এক কাপ চা দেবে?.

উজ্জয়িনী উঠে গেল।—দাসী ছাড়া আমি আর কিছু না ওর কাছে—মনে-মনে বলল নিজেকে। সব ভালবাসা-টালবাসা শুকিয়ে গেছে। দুটো জঘন্য

শরীর ছাড়া আমাদের আর কিছু পড়ে নেই। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাবনাটা নাড়া-চাড়া করল।

চা বানাতে সময় নিল কিছুটা। চা নিয়ে ফের যখন বসার ঘরে ঢুকেছে, দেখে, অভ্রর সামনে আর একজন লোক বসে। মাথায় কেষ্টঠাকুরের মতো কোঁকড়া চুল, তেল চকচকে। গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি, শাদা পাজামা। বিড়ি খাচ্ছে লোকটা। অভ্রকে একটু বিচলিত দেখাচ্ছে।

ও ঢুকতে শুনলো, অভ্র বলছে : জায়গাটা কোথায়?

লোকটা বলল, গ্রে স্ট্রীটের কাছে।

—ডাক্তার দেখানো হয়েছে?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, একটু ভেবে যেন, অভ্র জিগ্যেস করল, বাড়ি নিয়ে আসা গেল না?

—নিয়ে আসার মতো অবস্থা নেই। কোঁকড়া চুল লোকটা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে, খুবই অসুস্থ। আপনি একবার আসুন। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বলল, ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

—ট্যাক্সি লাগবে না, আমি গাড়ি বার করছি। বলে অভ্র উঠে দাঁড়াল সটান, যেন জরুরী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

লোকটা ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেছে, সেই সময়ে ও টেলিফোন করল একটা। ওর এক ডাক্তার বন্ধুকে। বলল, এখুনি একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে। তুই অপেক্ষা কর, আমি তুলে নেব।

ডাক্তার বন্ধুটি কিছু একটা জানার চেষ্টা করছিল বোধহয়। ও বলল, পরে কথা হবে। বেরোবার আগে হতভম্ব স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, জ্যেঠামশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। লোকটাকে বলল, চলুন।

চৌরঙ্গী পার হয়ে সেণ্ট্রাল এভিন্যু ধরে চলতে চলতে অভ্র কিছু খবরা-খবর নেবার চেষ্টা করল লোকটির কাছে। ওর নাম ষষ্ঠী। মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বিশেষ একটি বাড়িতে সুশোভনবাবু মাঝে-মাঝে যেতেন—ষষ্ঠী বলল। সাধারণত বিকেল নাগাদ। সাড়ে আটটা-নটায় চলে আসতেন। মহিলাটির নাম বীণা, বীণাপাণি। ওকে রেখেছিলেন সুশোভনবাবু।

—এ সব কতদিনের ঘটনা? অভ্র উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করে।

ষষ্ঠী যা বলল, তা প্রায় এইরকম : ও-বাড়িতে একটা ফ্ল্যাটে বীণা আজ প্রায় দশ বছর ভাড়া আছে। সুশোভনবাবু গেলে মাঝে-মাঝে বীণার ফ্ল্যাটে উৎসব পড়ে যেত। আশপাশ থেকে অন্য মেয়েরা এসে গানটান গাইত। তবে উনি বেশী লোকজন পছন্দ করতেন না। বেশীর ভাগ দিন চুপচাপ এসে চুপ-

চাপ চলে যেতেন। আজও সেইরকম রুটিন। হঠাৎ ফ্ল্যাট থেকে একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসতে প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে আসে। দেখে, সুশোভনবাবু বুকে হাত দিয়ে বালিশের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। জ্ঞান নেই। বীণা হাউমাউ করে কাঁদছে। এ কী হল রে। একটা ডাক্তার ডাক শিগগির। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি সব দেখেশুনে একটা ইনজেকশন দিলেন। বললেন, এঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই? তাদের খবর দাও।

ষষ্ঠী গড়গড় করে বলে যাচ্ছে: বীণা ওঁর বাড়ির ঠিকানা জানত, টেলিফোন নম্বর জানত। কিন্তু ফোন করতে দেয় নি। বলল, ষষ্ঠী তুই যা, ডেকে নিয়ে আয় ওঁর কে আছে, তাকে। ফোন করলে হয়তো আসবে না।

অভ্র গিয়ার বদলাতে-বদলাতে বলল, শুনে মনে হচ্ছে. সব শেষ হয়ে গেছে।

মণ্টু জিগ্যেস করল, কোরামিন পড়েছে?

ষষ্ঠী বলল, তা তো জানি না।

গ্রে স্ট্রীট আসার আগেই গাড়িটা বাঁদিকে ঘোরাতে বলল ষষ্ঠী। তারপর এ-গলি ও-গলি ঘুরিয়ে যেখানে পেঁছিল, সেখানে লোকে লোকারণ্য। মানে গলিটা ভরতি হয়ে গেছে লোকে। সবাই কৌতূহলী। কী ব্যাপার? কেউ কেউ ভিড় তাড়াতে ব্যস্ত, কিন্তু কেউই নড়ছে না যেন। এখন রাত সবে নটা, এ-পাড়া তো জমজমাট। তার ওপর একটা ঘটনা যখন পাওয়া গেছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিয়মরক্ষার জন্যে একটা পুলিশ।

বাড়িতে ঢুকতেই চারদিকে একটা সোরগোল পড়ে গেল।—এসে গেছে, এসে গেছে।

বাড়িটার ভেতরে চারদিকে কিলবিল করছে মেয়েরা। অদ্ভুত সব পেট বার করা পোশাক। উঁচু স্তন, স্নো-পাউডারে শাদা মুখ, টকটকে লাল লিপস্টিক। খালি পা। কেউ কেউ আবার কাঁদছে।

কোনও দিকে না তাকিয়ে মণ্টুকে নিয়ে অভ্র ষষ্ঠীর পেছন পেছন দোতলায় উঠে গেল তরতর করে। সিঁড়ির পাশেই ঘর। ঢুকে দেখল, মেজের ওপর মোটা গদির বিছানা। তার ওপর পড়ে আছে জ্যেঠামশায়ের দেহটা। চোখ বন্ধ। মাথা এবং বালিশ ভিজে সপসপ করছে। নিশ্চিত ঢের জল ঢেলেছে ওরা জ্ঞান ফেরাবার জন্যে। কোনও ডাক্তারের চিহ্নমাত্র নেই। মণ্টু ছুটে গিয়ে প্রথমে নাড়ি দেখল। স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করল। হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল ছুঁয়ে দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

মণ্টু যখন জ্যেঠামশায়ের নাড়ি, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, বুক পরীক্ষা করছে, সেই ফাঁকে অভ্র চারপাশটা ভাল করে দেখতে লাগল। না দেখে পারল না। ঘরটার

কোণে একটা খাট পাতা, তাতেও বিছানা পাতা আছে, বেড-কভার চাপা দেওয়া বিছানা। ঘরের কোণে একটা আয়না-লাগানো কাঠের আলমারী। গোটা দু-তিন চেয়ার। একটা রেডিও। ঘরে দুটো জানলা, ময়লা ছিটের পর্দা টানানো। জানলা দুটোর ওপরে কাঠের তাক। তার ওপর দেব-দেবীর ছবি। দেয়ালে বীণা নামের মেয়েটির কিশোরী বয়সের একটা ফটো টাঙানো।

বীণার বয়স এখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দরজার এক কোণে দাঁড়িয়ে। পরনে লাল শাড়ি, কপালে সিঁদুর। চোখ দুটো ফোলা, কিন্তু এখন কাঁদছে না। দেখতে-শুনতে মেয়েছেলেটা খারাপ না। অভ্র এক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু এই শোকের দৃশ্যে ওকে সদ্য-বিধবার মতো দেখাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, বীণার প্রতি একটু শ্রদ্ধাও হল। হাজার হোক একটা বেশ্যা মেয়ে। এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে জ্যেঠা-মশায়কে তো ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি করে পাচার করে দিতে পারত। রাস্তায় বা মাঠে ফেলে দিয়ে আসতে পারত। তা তো করে নি। উপরন্তু, বাড়িতে খবর দিয়েছে। ভদ্র-লোকের সম্মান বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। সে নিজে নষ্ট মেয়ে হতে পারে, জ্যেঠামশায় তো গৃহস্থ মানুষ, মানী লোক। জ্যান্ত থাকতে যার আনন্দ জুগিয়েছে এতদিন, মরে যাওয়া মাত্র তাকে হেনস্থা করে কী করে।

অভ্র জিগ্যেস করল, কখন মারা গেছেন উনি?

বীণা বলল, ষষ্ঠী বেরিয়ে যাবার পরেই ডাক্তার বলল, নাড়ি পাচ্ছি না। কী যে হয়ে গেল হঠাৎ। দেবতার মতন মানুষটা, শেষ পর্যন্ত এখানে বেঘোরে এসে মরে গেল। কপাল, আগের জন্মের পাপের শাস্তি। বলতে গিয়ে এবার কেঁদে ফেলল বীণা।

অভ্র বলল, কিছু ভাববেন না। আমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। আপনাকে ঢের অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে। দুঃখিত।

বীণার সঙ্গে 'আপনি' করে কথা বলতে পেরে অভ্র একটু স্বস্তি বোধ করল। অথচ স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় এত সম্মানের যোগ্য নয়। এই সব মেয়েদের লয়্যালটি বলে কোনও জিনিস তো জানা নেই। জ্যেঠামশায়ের বদলে যদি ও নিজে এখানে আসত আজ সন্ধ্যেবেলা এবং মরে যেত, তা হলেও হয়তো তার ব্যবহারের তারতম্য ঘটত না।

না, না, মুহূর্তের মধ্যে অভ্র তার চিন্তার গতিপথ সংশোধন করে নেয়। মনে পড়ে, ষষ্ঠী যে বলল, জ্যেঠামশায় ওকে রেখেছিলেন। রেখেছিলেন! মানে ও রক্ষিতা। তা হলেও, এরা কি আর সতীসাধ্বী হয় কোনওদিন? তবু, জ্যেঠামশায়ের কথা ভেবে বা যে কারণেই হোক, ঠিক এখন এই দৃশ্যটা ওর তত গ্লানিকর লাগছে না।

অভ্র কোনওরকম লজ্জা বোধ না করে ষষ্ঠীকে ডাকল, ষষ্ঠীবাবু, একটু

লোকজনের ব্যবস্থা করুন। জ্যেঠামশাইকে বাড়ি নিয়ে যাই।

ওরা যখন বাড়ি পেঁছিল, তখন রাত এগারোটা পার। বাড়ীর আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জ্যেঠামশাইকে নামানো হল গাড়ি থেকে। ষষ্ঠীর সঙ্গে আরও দুজন এসেছে। ওদের একজন একটু শব্দ করার চেষ্টা করতেই ষষ্ঠী চাপাগলায় গর্জে উঠল, এই খবরদার, ভদ্রলোকের মড়া, এক-দম হল্লা করবি না। বাড়িতে ঢুকতেই উজ্জয়িনী প্রায় ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল, অভ্র শাসন করল, খবরদার, এখন একদম শব্দ করবে না। আগে ঘরে এনে তুলি, তারপর যত খুশি কেঁদো। কিছু বুঝতে না পেরে উজ্জয়িনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মৃতদেহটার দিকে। এই কিছুক্ষণ আগে উনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, চুরুট খাচ্ছিলেন, আর এখন ওঁর লাশটা ধরে লোকে টানাটানি করছে।

চারজনে ধরাধরি করে সুশোভন চৌধুরীর লাশ টেনে তুলল বাড়ির মধ্যে। ওঁর ঘরে নিয়ে শোয়াল। গুনে-গুনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে লোকগুলোকে বিদেয় করল অভ্র। মণ্টু রইল সঙ্গে।

ওরা চলে যাওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাড়িতে যথারীতি কান্নার রোল উঠেছিল। উজ্জয়িনীর গলা সবচেয়ে জোরে।

রাত বারটার পর পাড়ার লোকজন মিলে সরল মনে ফুলের মালা-টালা দিয়ে সুশোভন চৌধুরীর মরদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়েছিল। মানুষটা পুণ্যাত্মা, একদিনও রোগে ভুগল না, এক মুখে সবাই ওঁর আত্মার স্বর্গলাভ কামনা করেছিল সেদিন।

সমাজ গড়ার সময় প্রয়োজনবোধে মানুষ ঢের নিয়মকানুন প্রচলিত করেছে। বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রথাও বিধিবদ্ধ হয়েছে ক্রমশ। চিরন্তন নয়, সাময়িক কোনও উদ্দেশ্যসাধন নিশ্চিত অভিপ্রেত ছিল এইসব নিয়মকানুনের পেছনে। যেমন, আমাদের যৌথ পরিবার কৃষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। যেমন, পুরুষশাসিত সভ্যসমাজ নারী-নির্যাতনের জন্যে নয়, শক্তিমানের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করার উদ্দেশ্যে। কারণ নারীজাতির ঢের প্রাকৃতিক হ্যাণ্ডিক্যাপস আছে। দেখ, দরকার ফুরোতেই আমাদের বহুবিবাহ প্রথা বর্জিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য, পৃথিবীর কোথাও, এক নারীর সঙ্গে একজন পুরুষকে চিরদিনের মতো বেঁধে দিয়ে বিবাহ-নামক যে অদ্ভুত ব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল কোনও এক সময়, তার পরিবর্তন হয়নি। একটা পুরনো অভ্যেস আমরা ছাড়তে পারছি না। অথচ, জীবনের অন্য সব দিক এত বদলে গেছে। মানুষ কত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একে অন্যের থেকে। তোমার কি মনে হয় না, ফুলের মালা দিয়ে বাঁধা নরনারী আর আমরণ একা থাকতে পারছে না ? ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন অনুষ্ঠান আজ যেমন নেহাতই প্রহসন, তেমনি এই তথাকথিত বিয়ে ব্যাপারটাও ? অথচ এই কৃত্রিম জিনিষটা ঘুচিয়ে দিতে আমাদের এত আলস্য, এত দ্বিধা! ভাবটা, কাজ তো চলে যাচ্ছে। মুক্তি দাবি করে আমরা ক্রমশ বৃহত্তর বাঁধনেই আবদ্ধ হচ্ছি একথা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে ঢের ছোটখাট বাঁধন তো ছেঁটে দিয়েছি। তৎপর হতে হবে আমাদের। এই শতক শেষ হবার আগে ব্যক্তি-মানুষকে ইচ্ছেমতো একা থাকার অধিকার দিতে হবে। দল বেঁধে বা জোট বেঁধে বাস করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, যেহেতু তাতে আর নিরাপত্তা নেই।

অভ্র অনেকক্ষণ ধরে যা বলবার চেষ্টা করছিল রণেনকে উপলক্ষ করে উপস্থিত সবাইকে তার মর্মার্থ হল এই। ও যা বলে, শেষ কথা হিসেবে বলে। নিজের বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে ওর আস্থা খুব বেশী। এতটা না হলেও এর কিছুটা অংশ রণেনও সমর্থন করে হয়তো। তবে মুখ ফুটে আলোচনায় বা তর্কে নামে না। সেদিক থেকে অভ্রর মনটা একটু খোলা, অসাবধান। ওকে ভুল বোঝার সুযোগ করে দেয়। রণেনের স্বভাব একটু চাপা। ও জানে, মানুষকে যত কম জানা যায়, কম বোঝা যায়, ততই ভাল।

রবিবারের সকাল। রণেনের বসার ঘরে বেশ আড্ডা জমেছে। ছোট ঘর। ছিমছাম বসার ব্যবস্থা। বেত ও প্লাস্টিক দিয়ে বোনা কয়েকটা চেয়ার, শান্তি-

নিকেতনের মোড়া একটা, নিচু টেবিল—এইমাত্র আসবাব। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ও রবীন্দ্রনাথের ছবি। টেবিলের ওপর এ্যাশট্রে। মধ্যবিত্ত রুচিশীল পরিবারে যেমন থাকে।

অভ্রর সঙ্গে মণ্টুও এসেছে। দু-রাউন্ড চা, পাঁপড়ভাজা, পেঁয়াজের বড়া পরিবেশন করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবার অভ্র আর-এক কাপ চা চাইলেও চাইতে পারে। ওর গলা যদি শুকিয়ে উঠে থাকে তো দোষ নেই।

অভ্র একা থাকা নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল এইমাত্র, খুব জোর দিয়েই একা থাকার অনিবার্যতা ব্যাখ্যা করল। কিন্তু ও একা নেই। ওর ঢের বন্ধু-বান্ধব, বাড়িতে সুন্দরী চপলা স্ত্রী; ভাল উপার্জন করে। ওরা গাড়ি চড়ে প্রায়ই বেড়াতে যায় এদিক-ওদিক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও সিরিয়াস বিভেদ আছে বলে তো মনে হয় না। বরং রণেন উজ্জয়িনীর প্রতি একটু অনুরক্ত বলে অভ্রর মনে বোধহয় অল্প ঈর্ষা আছে, প্রকাশ করে না। সোমারও আছে। ভালই তো. ঈর্ষায় মানুষের প্রতি টান বাড়ে। আগেকার মতো ভিড়ের মধ্যে আজকাল কে আর বসবাস করে বলো। তা বলে কি লোকে একা হয়ে গেছে? ওদের তো দুটির সংসার। জ্যেঠামশাই তো বাড়িঘর রেখে স্বর্গে গেলেন। সব আছে অভ্রর, অভ্রদের। একটা বাচ্চা-কাচ্চা হলে এই একা থাকার শখটা হয়তো কেটে যাবে। সোমা মনে-মনে এইসব ভাবনা নিয়ে খেলা করছিল।

অভ্র একটু থেমে বলল, আর এক কাপ চা পাওয়া যাবে সোমা দেবী?

এত বকবক করলে তেষ্টা পাবে না! ওকে দেখে সোমার কেমন মায়া হল।

সোমা মনে-মনে বলল, নিরাপত্তা কোথায় আছে, কীসে আছে বলুন! এমন সময়-কালের মধ্যে আমরা বাস করছি যে, যে কোনও মুহূর্তে একটা দেশ বা গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অথচ, এ অবস্থা ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি। মানুষই করেছে—রণেনের কথাগুলো সোমা মনে-মনে আবৃত্তি করছিল।

আবার এ অবস্থা থেকে আমাদের মানুষই ফিরিয়ে আনতে পারে। আমাদের আশা রাখা দরকার। যে কোনও মুহূর্তে সর্বনাশ হতে পারে বলে কি আমরা এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা ভুলে মধ্যযুগে ফিরে যাব? অসভ্য হয়ে যাব?—রণেন তর্ক করতে গিয়ে বলেছিল, আমরা কে না জানি, সঙ্গম করাই তো মানুষের একমাত্র কর্ম নয়। প্রধান কৃত্যও নয়। তবে ক্ষিদে-তেষ্টার মতো যৌনতারও দাবি খুব প্রকট। অথচ সাময়িক। তাই আমাদের পূর্বপুরুষ এই দাবি মেটাবার একটা সংগত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কনভিনিয়েণ্ট ব্যবস্থ করে দিয়ে গেছেন। যাতে করে, প্রয়োজনটুকুও মিটিয়ে আমরা অন্য চিন্তা করতে পারি। অন্য বেশী দরকারি কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। এর মধ্যে প্রেমের প্রসঙ্গ যেমন পেরিফেরাল, পর্নোগ্রাফিকে আনাও তেমনি অতিরঞ্জন।

থিয়োরির দিক থেকে অভ্রর সঙ্গে রণেনের কোথায় একটা সূক্ষ্ম অমিল আছে। তা না হলে রণেন কী করে বলল, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস বা সহাবস্থান—যাই বলো না কেন—উদ্দেশ্য হল কর্তব্যের, শুধু আনন্দের বা প্রমোদের প্রয়োজনে না। সঙ্গমের মধ্যে আনন্দটুকু—আমরা জানি—সাময়িক, স্ত্রী-পুরুষকে কাছাকাছি আনার জন্যে, একট বড়ো কাজ করিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির কৌশল। তা না হলে সবাই একা-একা থাকত, মাছেদের মতো—ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছাড়া-ছাড়া। সমাজ গড়ে তোলার কোনও কাজ সম্ভব হতো না।

চা নিয়ে এবার যখন সোমা ঘরে ঢুকল, তখন রণেন বলছে, এলিয়েনেশন শব্দটা ব্যবহারে ব্যবহারে পচে গেছে। তাই ওটা আবার ব্যবহার করতে চাইছি না। তবে, অভ্র তুমি যা বলতে চাইছ, আমাদের মানিয়ে চলতে পারার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা, সর্বক্ষণ একরকম তিতকুটে মন-খারাপ বোধ—এর জন্যে যাকে তুমি একমাত্র আসামী হিসাবে হাজির করেছ কাঠগড়ায়, সে-ছাড়া আরও আসামী আছে। বক্তৃতা দেবার সময়ে এরা পরস্পরকে তুমি সম্বোধন করে, সোমা লক্ষ করেছে।

সোমা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। অভ্র সোমার নিকট কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল, একটু বা কুণ্ঠিত মনে হল ওকে। হয়তো রণেন ওর যুক্তিটা কাটছে বলে, ওর পয়েণ্টটার জোর কমিয়ে দিচ্ছে বলে। কিংবা হয়তো ওর মনে হয়েছে, মেয়েলি হাতের স্পর্শে স্নিগ্ধ এই রবিবারের আড্ডায় ওর কাটা-কাটা যুক্তিগুলো দাঁড়াতে পারছে না। শৌখিন, ভুয়ো মনে হচ্ছে।

রণেন একটু চুপ করে থেকে বলল, মোহ—আমাদের মোহটাই ভেঙে যাচ্ছে। আকাশ আকাশ নয়, রঙ রঙ নয়, ভগবান ভগবান নয়, সত্য সত্য নয়—ভালবাসা—বুঝলি, এইসব চলে গেলে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। নতুন কোনও মোহ না তৈরী করে নিতে পারলে আমার মনে হয়, পুরনোগুলো ছাড়া উচিত না।

—অসম্ভব। অভ্র জোর দিয়ে বলল, না ছাড়লে পাবে না। জানতেই পারবে না, কী চাইছ। আসল কথা—

রণেন এবার একটু অধৈর্য হয়ে পড়ল। বলল, কী যে বাজে বক্তৃতা ঝাড়ছিস না তখন থেকে! কী তোর আসল কথা, বুঝিয়ে বল্ দিকি।

—বললাম তো, না ছাড়লে কিছু পাওয়া যায় না।

—এতই যদি তোর দৃঢ় বিশ্বাস, তবে ছেড়ে দ্যাখ্। দেখা সবাইকে।

মণ্টু এবার কথা বলল, ওইখানেই তো সবচেয়ে বড়ো মুশকিল। পরের পাওয়াটা বড়ো অনিশ্চিত, তাই ছাড়তে এত দ্বিধা, এত আলস্য—

রণেন এবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে।—আসল কথা, অভ্র যে-যুক্তির কথা বলছে তার খানিকটা ওর বইয়ে পড়া, খানিকটা ওর উপলব্ধি। সেজন্যে

ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না। একা কেউ সে মুক্তির সন্ধানে বেরোলে পতিত হয়ে যাবে। সময় হলে দেখো, এই থিওরির ওপর একটা আন্দোলন গড়ে উঠবে কোনওদিন। সবাই তাতে যোগ দেবে। তবে, আমার মতে, সে-সময় এখনও আসে নি।

অভ্র যোগ দেয়, রিভ্যালুয়েশন অফ রিলেশনশিপ। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের পুনর্বিচার। রণেন, তুই কথাটাকে ছেঁদো বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলি, কিন্তু নেহাত ছেঁদো কথা আমি বলি নি। বলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল অভ্র।

রণেন বলল, আমায় ভুল বুঝিস না। তোর বক্তব্যে আমার তেমন আপত্তি তো নেই। আপত্তি ভঙ্গিতে। এত নিঃসন্দেহে তুই ভারি-ভারি কথাগুলো বলে ফেলিস না!

মণ্টু একবার সোমার দিকে মুখ ফেরাল। তারপর ডাক্তারসুলভ স্থির গলায় বলল, তা সত্যি। যা বিশ্বাস করি আমরা, তা যখন ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারি না, তখনই বোঝা যায়, আমাদের বিশ্বাসে ফাঁকি আছে। আমাদের মনে সব ব্যাপারেই গভীর সন্দেহ। এই যুগের সেইটেই অসুখ।

—তাই, কিছু নেই জেনেও আমরা সব কিছু পুরনো আঁকড়ে পড়ে আছি। তবে, এর মধ্যে আমি অসুস্থতা কিছু দেখি না। রণেন বলল।

অভ্র এবার চেপে ধরে ওকে। তুই-ই তো বললি এক্ষুনি, আমাদের মোহ ভেঙে গেছে, কিছুই সত্যি নয়। ভালবাসা ভালবাসা নয়—

—বলেছি, রণেন জবাব দেয়, আবার এ-ও তো বললাম, নতুন মোহের জন্ম না হলে আমরা পুরনোটা ছাড়তে ভয় পাচ্ছি। যাবো কোথায় বল্। জীবনের এত বড়ো ভার নিয়ে মানুষ তো কোথাও দাঁড়াবে!

এমন সময় বেল বাজল দরজায়। সোমা দরজা খুলল। সামনে সশরীরে পশুপতি। অভ্রর চাকর। হাতে একটা চিরকুট। বৌদি পাঠিয়ে দিয়েছে। রণেনের বাড়িতে টেলিফোন নেই, তাই।

জয়ীর হাতের লেখা। 'শিগগির বাড়ি চলে এসো। একজন ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন।' পড়ে চিরকুটটা অভ্রর হাতে দিল সোমা।—একজন ভদ্রমহিলা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আর কী চাই!

কে আবার এই ভদ্রমহিলা, কোথা থেকে উদিত হলেন, কে জানে। একটু হন্তদন্ত হয়ে উঠে পড়ল অভ্র, মণ্টুও উঠল। ভাঙল আড্ডা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই হুশ করে বেরিয়ে গেল ওরা রণেনদের গলিটা থেকে।

আমি সোমা দত্ত। আগে বসু ছিলাম। লেখাপড়া খানিকটা পর্যন্ত শিখেছি, গানও শিখেছিলাম। এ-সব না শিখলে আজকাল মেয়েদের বিয়ে হয় না। প্রেম করেও বিয়ে হয় না। না, আমাদের বিয়ে প্রেম করে হয় নি। সম্বন্ধ করে হয়েছে। মামাকে গুনে-গুনে অনেকগুলো টাকা খরচ করতে হয়েছিল রণেনদের দত্তবাড়িতে দুধ ও আলতা-গোলা থালার ওপর আমায় দাঁড় করাবার জন্যে। রণেনের আগেও দু-একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে নি। এবং সম্ভবত, আমাকে অপছন্দ করার জন্যে সে-সম্বন্ধগুলো ভাঙে নি। হয় মামার টাকা-পয়সা কম ছিল বলে, কিংবা আমি চাকরি করতাম বলে। অন্তত সেই রকম কথা আমাকে শোনানো হয়েছিল।

অনেক পাত্রপক্ষ মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করেন না। ওঁদের ধারণা, চাকরি করলে মেয়েরা সংসারে মন দেয় না, স্বামী-পুত্রের সেবাযত্ন করে না। টাকা-পয়সার স্বাদ পেলে মেয়েদের নাকি মাথা ঘুরে যায়। ওই ধরনের লোকেরা বিয়ে দিয়ে, বিয়ে করে, মেয়েদের পুষতে চান। যেমন, লোকে গোয়ালে গরু পোষে, ছাগল-মুর্গি পোষে। কাজে লাগে. উপকারে লাগে। এঁরা একটি মেয়ের সঙ্গে একটি পুরুষকে বাঁধেন না। শুধু মেয়েটিকেই একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধেন।

অভ্র বা রণেন ঠিক এই জাতের নয়। বাঁধন কতকটা এরাও নিয়েছে। তাই এদের ছটফটানি। তবে, যা বলছিলাম. রণেন, আমার স্বামী, একটু চাপা. একটু ভিতু; অভ্র তা নয়। ওর ছটফটানি দেখতে পাওয়া যায়। ওকে আমার মন্দ লাগে না।

অভ্রর ছোঁয়াচ লেগে রণেন যদি কোনওদিন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে. অন্য কোনও মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমায় এবং আমাদের পরিবারকে হঠাৎ ত্যাগ করতে চায়, তখন আমি কী করব? জানি না। নিশ্চিত বাধা দেব। দাঁতে দাঁত দিয়ে রোখার চেষ্টা করব। না পারলে, তখন আমিই ওকে বলব, তোমার যা ইচ্ছে কর। আমাকে চলে যেতে বল না। কোথায় যাব আমি। কোথায় গিয়ে কেমন করে আবার নতুন করে ঘর পাতব? তোমাকে হয়তো আমি আদর্শ স্বামী বা বন্ধু বলে মনে করি না, এই পরিবারও কোনও দিক থেকে 'আদর্শ পদবাচ্য নয়, তবু আমি মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি. এই আমার ভাগ্য। এর ভেতর থেকে আমায় সুখটুকু খুঁটে নিতে হবে। আমি, দরকার হলে, ওর পায়ে ধরেই বলব, লোকের চোখে আমায় ছোট কর না। দোহাই, যাতে তুমি

সুখী হবে মনে করছ, তাই কর। আমি বাধা দেব না।

কারণ, পরিত্যক্ত হওয়া কী জিনিস আমি জানি। আমার বাবা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, মারা না গিয়ে থাকলে এখনও নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন। কুড়ি বছর হল। আমার তখন বয়স দশ। মায়ের ছাব্বিশ। মা রুগ্ন বা কুৎসিত ছিলেন না। গরিব হলেও আমাদের এমন কোনও অভাবের সংসার ছিল না, অশান্তিময় বাড়ি ছিল না যে, বাবাকে ছেড়ে পালাতে হতো। তবু বাবা পালিয়ে গিয়েছিলেন। কোনও খবর পর্যন্ত দেন নি তারপর। লোকেরা কেউ বলেছে, নিশ্চয় অন্য সংসার পেতেছেন কোথাও, কেউ বলেছে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে থাকবেন। বাবার নাকি ছোটবেলায় একটু বৈরাগী ভাব ছিল। শ্মশানে মড়া পোড়ানো দেখতে ভালবাসতেন।

তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে সবে। মারামারি খেয়োখেয়ি লেগেই আছে। কাগজ পড়ে বলতেন, লোকেরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস নিয়ে কী সোরগোল না করে! দলে-দলে ঝগড়া মারামারি। পাড়ায়-পাড়ায় লাঠালাঠি। অথচ একটা মানুষের কাছে এ-সব কিছুরই কোনও মূল্য নেই। এই উন্মত্ত খেলাঘর থেকে হঠাৎ একদিন তোমায় তিনি হাত ধরে তুলে নিয়ে যাবেন, ঘাম-রক্ত মুছিয়ে দেবেন, আদর করবেন। আর সকলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখবে। তোমার ফেলে-যাওয়া খেলনাগুলো নিয়ে ওরা আবার খেলতে শুরু করবে।

আমারও মনে হয়, বাবা বোধহয় সন্ন্যাসীই হয়ে গিয়েছিলেন। নাকি, অভ্র যাকে 'একা থাকার অধিকার' না কী যেন বলছে, সেই অসুখ ওঁর কুড়ি বছর আগেই ধরেছিল? বৃহত্তর কোনও অভীষ্ট লক্ষ্যে না, শুধুমাত্র বর্তমানে বীত-শ্রদ্ধ হয়েই চলে গেলেন? হবেও বা।

কিন্তু মায়ের মুখ তো আমি ভুলব না কোনওদিন। সেই পরিত্যক্ত হওয়ার গ্লানি ও অপমান। একজন পুরুষ, বিশেষ পুরুষ তাকে গ্রহণ করেও গ্রাহ্য মনে করে নি, ভোগ্য মনে করে নি, ফেলে দিয়ে চলে গেছে। শুধু ভোগ্যবস্তু হতে মেয়েরা অনেকে চায় না, অন্তত তাই বলে মুখে। তবু, আমি জানি, যে-মেয়ে কোনও পুরুষের মনে লোভ জাগাতে পারে না, তার মতন দুঃখী আর কেউ নেই। এক বছর আগে পিকনিকের রাত্রে এই কথা আমার মনে হয়েছিল।

আমি সোমা দত্ত, সুশ্রী, যুবতী। তখন এক বছর আগে, বয়েস ঊনত্রিশ, নির্জন মধ্য রাত্রে অন্ধকার ঘরে একা অভ্রর সামনে নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেদিন, সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে ভয়ই প্রধান বোধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই খামখেয়ালিপনা, নতুনত্বের নেশা, সেই মারাত্মক খেলা, আমার মধ্যেকার সব ইঁট-পাথর খসিয়ে দিচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, চিৎকার করে উঠি, রণেন, তুমি কোথায়? তুমি আমায় সর্বনাশ থেকে বাঁচাও।

না, চিৎকার আমি করি নি। কারণ এ-ব্যবস্থা ছিল পূর্বকল্পিত। রণেন আমার কাছাকাছি ছিল না। ও ছিল অন্য ঘরে। সেই খেলার অপরপক্ষ হয়ে। শহরের বাইরে এক নির্জন ডাকবাংলোয় আমাদের দুই দম্পতির সারাদিনব্যাপী ছুটোছুটি, রান্নাবান্না, স্নান এবং বনভোজন। আর সারা রাত ধরে বিভীষিকাময় খেলা।

হ্যাঁ, সেই পিকনিকের ঘটনাই বলছি। কলকাতার কাছে কোনও এক জায়গা ছিল সেটা। নাম মনে নেই। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। মনে আছে, অভ্রর গাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা চারজন। মৌরীকে নিয়ে যাই নি আমরা। ছোট মেয়ে, সারা দিনের ধকল সহ্য করতে পারবে না। শাশুড়ির কাছে রেখে গিয়েছিলাম। বলে গিয়েছিলাম, ভাল লাগলে রাতটা আমরা থেকেও যেতে পারি ওখানে। আপনি চিন্তা করবেন না। আগে থেকে থাকার জায়গাটা ব্যবস্থা করা আছে।

এখন মনে হয়, ভালই করেছিলাম। আবার মনে হয়, ও সংগে থাকলে ভাল হতো, হয়তো আমরা সে-দিনই ফিরে আসতাম। রাতটা ওখানে কাটাতে হতো না।

যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা ক'টা হবে? ন'টা। আমরা কিছু স্যানডউইচ, কলা ও ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে গিয়েছিলাম। যাবার সময় গাড়িতেই সেগুলো ধ্বংস করা হল। সবচেয়ে বেশী খেল উজ্জয়িনী। ওর বড়োসড়ো শরীর, খিদেটা একটু বেশী। আমরা দুজন মেয়ে পিছনের সীটে বসেছিলাম। ওরা সামনে বসে এন্তার সিগারেট টানছিল।

রাস্তার পাশে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে হঠাৎ অভ্রই বলল, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে খাদ্যদ্রব্য কিছু পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই, শহর থেকে একটু দূরে, ভেতরে। কিছু রিজার্ভ এখান থেকে তুলে নেব নাকি?

ওর জয়ীর মুখে তখনও আধখানা কলা। কথা বেরুচ্ছে না, তবু তার মধ্যেই বলল, নিয়েই নাও বরং। সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকা যাবে না।

রণেন বলল, কর কী? সবই যদি ঠিকঠাক থাকবে, তবে পিকনিক কী? যেমন আছি তেমনি চল। অন্তত পাওয়া না-পাওয়ার অনিশ্চয়তাটুকু আমরা উপভোগ করি। জয়ী, তুমি কিছু ভেব না, গাড়িটা তো সংগে আছে, তোমাকে না খাইয়ে রাখব না। ভাবটা, যেন রণেনই উজ্জয়িনীকে খাইয়ে পরিয়ে রাখার ভার নিয়েছে। শুনে আমরা তিনজনে হেসে উঠলাম। জয়ী একটু লজ্জিত হল। এবং গাড়ি ছেড়ে দিল অভ্র। আমরা কিছুই কিনলাম না। জয়ীটা আদরের কাঙাল, মনে হতে, মেয়ে হিসেবে আমার নিজেকেও হীন মনে হল মুহূর্তের জন্যে।

প্রকাণ্ড একটা মাঠের মাঝখানে বাংলোটা। আমরা ঢুকে কাউকে দেখতে

পেলাম না। তখনও এত গরম পড়ে নি। একটা গাছের নিচে গাড়িটা দাঁড় করানো হল। আমরা নেমে ঘাসের ওপর বসলাম। ওরা বন্ধু দুজন লোকজন খুঁজতে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর একজন টিকিওলা লোককে নিয়ে হাজির হল ওরা। পেয়েছি—এঁর নাম ভগলু। ইনিই আপাতত এই অঞ্চলের মালিক। আমাদের সেবাযত্নের ভার এঁর ওপর ন্যস্ত করে আমরা একটু বিশ্রাম করতে পারি।

ভগলু মেয়েদের দিকে ফিরে অবনত হয়ে নমস্তে জানাল। বিনীত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার বাংলায় তারপর বলল, এই খোলা জায়গায় আপনারা কেন বসবেন দিদিমণি, আসুন ভেতরে গিয়ে বসুন। ঘর খুলে দিচ্ছি। পাখা চালিয়ে দিচ্ছি।

আমরা উঠে পড়লাম। রণেন ঠাট্টা করল, তোমরা ছিলে বলে চটপট একটা সুরাহা হল। মেয়েদের মহিমা বিশ্বজোড়া।

কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা বারান্দা। ভগলু ঘর খুলল। ঘর থেকে চারটে বেতের চেয়ার বার করে আনল। বারান্দায় পাখা ঝুলছে, আমরা টান হয়ে বসে পড়লাম।

অভ্র, সম্ভবত উজ্জয়িনীর কথা মনে করেই, জিগ্যেস করল, কিছু খাবার-টাবার জোগাড় করতে পারো ভগলুভাই! কী পাওয়া যাবে?

—যা চান।

—মুরগী, চাল, তেল, নুন, মশলা।

—মিলবে।

আমি বললাম, বসানপত্র?

—বাংলোতেই আছে। উনুনও আছে, তবে কাঠ আনতে হবে।

অভ্র টাকা দিতে যাচ্ছিল, রণেন বাধা দিল। দেখে ভাল লাগল আমার। সবটা ও-ই বা কেন খরচ করবে। গাড়িতে তেল তো কিছু কম পোড়ে নি। আবার ফেরা আছে। দশ টাকার দুটো নোট বার করে রণেন বলল, এর থেকে দুটো মুরগী, এক কিলো চাল, কাঠ আর তেল নুন মশলা—হয়ে যাবে তো?

উজ্জয়িনী বলল, আর আলু, পিঁয়াজ, আদা...

অভ্র যোগ করল, আর একটু চা-পাতা, দুধ, চিনি।

ভগলু একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন হিসেব কষল। আসলে ও সবই জানে। এত অবলীলায় যখন মিলবে বলেছে, তখন ও বেশ ভাল করেই জানে, চারজনের খাবার বানাতে কত টাকার বাজার করতে হবে। এখানকার রক্ষক ও ভক্ষক হিসেবে এ-কাজ তো ও নিত্যই করছে। তবু আমরা ওর শেষ কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব রইলাম।

কিছু পরে ভগলু বলল, আরো পাঁচ টাকা দিন। যা বাঁচবে ফেরত দেব।

মোট পঁচিশ টাকা দিয়ে ওকে বিদেয় করা হল। যাবার সময়ে উজ্জয়িনী পিছু ডাকল ওকে।—একটু তাড়াতাড়ি করে ফিরো ভগলুভাই। রান্না হলে তারপর তো খাওয়া।

আমরা আবার হাসলাম। এবার কিন্তু ও লজ্জিত হল না। ওর খাদ্যলোভী ইমেজ মাঝে-মাঝে আমাদের কিছু হাস্যরস সরবরাহ করছে দেখে ও ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে। ভালই। বাইরে গেলে এক-একজনকে এক-এক ব্যাপারে ঠাট্টা করতে পারার সুযোগ থাকা উচিত। রসিকতার স্কেপগোট। এ-যাত্রায় জয়ী তাই। আসল কথা, আমাদের প্রত্যেকেরই মেজাজটা বেশ খুশী-খুশী হয়ে উঠেছে।

ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক হচ্ছে দেখে ওরা দুজন চেয়ারে সত্যিই এলিয়ে পড়ল এবার। আমরা, মেয়েরা, সরেজমিন তদন্তে বেরুলাম। বা ঢুকলাম বলা উচিত।

দুটো শোবার ঘর। প্রথম ঘরের মধ্যে এক পাশে বসার চেয়ার, নিচু টেবিল, যা ভগলু বাইরে বার করে দিয়েছে, আর জোড়া-খাট বিছানা। দ্বিতীয় ঘরটার মধ্যে, এক পাশে খাবার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি এবং জোড়া-খাট বিছানা। ভেতরের দিকে আর একটা বারান্দা। বারান্দায় এক পাশে একটা বেশ বড়গোছের বাথরুম, দুটো বালতি, মগ প্রভৃতি। অন্য পাশে রান্নাঘর। সেটাও বেশ বড়। একটা আলমারী আছে—তার ভেতরে কাপ, প্লেট, কড়া, ডেকচি, কাঁচের গেলাশ—চারজন থাকা-খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সরঞ্জাম। সামনে যেমন সিঁড়ি দিয়ে ওঠার, পেছনে তেমনি সিঁড়ি দিয়ে নামার ব্যবস্থা। নেমে একটু দূরে একটা কুয়ো। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখান থেকে একটা ছোট কুঁড়েমতন বাড়ি দেখা যায়। আমরা বুঝলাম, ওটা ভগলুর বাসস্থান; কোয়ার্টার আর কি।

জয়ী বলল, চল দেখে আসি ভগলুর সংসার।

প্রথমে আমার মনে হল, কী দরকার। আমরা তো ওদের সুখ-দুঃখের নাগাল পাব না। শুধুই কৌতূহল মেটানো। মানুষ সম্পর্কে মমত্বহীন কৌতূহল থাকা অনুচিত। ওটা বড় লোক-দেখানো, বড় ভালগার। তারপর ভাবলাম, আর তো কিছু করার নেই, যাওয়াই যাক না।

মাঠ পার হয়ে সেই কুঁড়ে ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। গিয়ে দেখি, একটা অন্ধকার গোছের প্রায় জানলাহীন ঘরে একজন স্ত্রীলোক। পাশে দড়ির খাটিয়া, যাকে ওরা চারপাই বলে। তার ওপর একটা ছোট ছেলে শুয়ে। স্ত্রীলোকটি ওকে পাখা দিয়ে বাতাস করছে।

আমরা যেতেই ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। জিগ্যেস করলাম, এটা ভগলুর বাড়ি?

ও বললে—হাঁ, জী।

স্ত্রীলোকটিকে দেখে খুব স্বাস্থ্যবতী মনে হল না। গরিবের সংসার। নিশ্চয় খুব অল্প মাইনে পায় ভগলু, বাকিটা দাক্ষিণ্যে চলে।

জিগ্যেস করলাম, তুমি ওর জরু?

—হাঁ, জী।

—যে শুয়ে আছে সে কি তোমাদের ছেলে?

ও বলল, হাঁ জী।

জয়ী ওর ঘরদোর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। জিগ্যেস করল, ওর কি অসুখ করেছে? মাথায় হাওয়া করছ কেন?

—বহুৎ বুখার। ছোট্ট করে জবাব দিল স্ত্রীলোকটি।

অমনি আমরা থমকে দাঁড়ালাম। পক্স নয় তো? ছেলেটার বাপকে এই অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে আমরা খাবারদাবার আনতে পাঠিয়েছি, এই কথা ভেবে কোনও লজ্জাবোধ হবার আগে আমাদের মনে হল, সর্বনাশ। বসন্ত যে বিষম ছোঁয়াচে রোগ। আমাদের হবে না তো?

জয়ী বলল, চল, ফিরে যাই।

আমিও বললাম, চল। বাড়িতে ছোট মেয়ে আছে বলে প্রথমেই আমার মনে হল এবং জয়ীকে আড়ালে জিগ্যেস করলাম, তোমাদের টিকে নেওয়া আছে? আমরা নিই নি এখনো। ফিরে গিয়েই নিতে হবে।

জয়ী বলল, জিনিসপত্র নিয়ে আসার পর ভগলুকে ছেড়ে দিতে হবে। যা পারি, আমরাই রান্না করে খাব। কী বল?

তাই করা হয়েছিল। ভগলু ফিরে এসে দুটো জ্যান্ত মুরগী নামিয়ে রাখল, পা বাঁধা। আর সব ফরমায়েশি জিনিসপত্র। জিগ্যেস করল, কেটে দেব?

জয়ী বলল, না না, আমরা সব ঠিক করে নেব। তুমি বরং বাড়ি যাও। তোমার ছেলের অসুখ। তারপর বলল, গাড়িটা একটু দেখো—

—সে আপনি ভাববেন না। মুক্তি পেয়ে যেন কৃতজ্ঞ হল ভগলু।

আমরা কিন্তু ওর ছেলের শুশ্রূষার কথা তত ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম, বেশীক্ষণ সঙ্গে থাকলে আমাদের ছোঁয়াচ লাগতে পারে। ভগলু চলে গেল।

রণেন বলল, হিসেবটা দিল না। কিছু পয়সা নিশ্চয় বেঁচেছে।

আমরা সমস্বরে বললাম, নিক গে।

প্রথমে এক রাউন্ড করে চা খাওয়া হল। তারপর আমরা কাজ ভাগাভাগি করলাম। অভ্র বলল, আমি হিংসায় বিশ্বাসী, আমি আনড্রেস করতে ভালবাসি। সুতরাং মুরগী দুটো আমিই কাটব, ছাড়াব।

রণেন উনুন ধরিয়েছে আগেই, জল তুলে দিয়েছে। উজ্জয়িনী রান্না করবে। আমি জোগাড় দেব, পরিবেশন করব। কাজ ভাগাভাগি হয়ে গেল।

সামান্য ওই রান্না করতে গিয়ে আমরা চরজনে হিমসিম। শেষপর্যন্ত যখন সব সারা হল, তখন বেলা প্রায় দুটো। মুরগীর মাংস চেখে দেখল অভ্র, দারুণ হয়েছে। বেশ ঝাল। একটু মিষ্টি খাওয়া দরকার। বলে সকলের সামনে জয়ীর গালে সশব্দে একটা চুমু খেল, তারপর বলল, সুইট-হার্ট গালটা ধুয়ে রেখো। খাওয়ার পর প্রত্যেকের কাজে লাগবে।

হৃষ্টপুষ্ট চেহারা নিয়ে খাদ্যবিলাসী উজ্জয়িনী বেচারা ক্রমশ খাদ্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুয়োতলায় গিয়ে আমরা স্নান করলাম। পুরুষ দুজন জল তুলে দিচ্ছিল। বালতি ভরতি জল নিয়ে কে আর বাথরুম পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। আমরা

দুজন কুয়োতলাতে স্নান সারলাম। আমার লজ্জা করছিল। ভেজা কাপড়ে শরীরের কিছুই ঢাকা দেওয়া যায় না। রণেন আর অভ্র দুজনেই যেন পরস্ত্রী দেখছে, এইভাবে আমাদের দেখছিল। জয়ীর শরীরটা মোটাসোটা, কিন্তু লজ্জা-সরম ওর একটু কম। ভেজা কাপড় গায়ে সেঁটে রয়েছে। পায়ের খাঁজে সিল্কের কাপড়টা বসে গেছে, ঢিবির মতো বুকদুটো জেগে উঠেছে, ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর মুখটা গোলমতন। কানের পাশ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মাথার চুল ওর পাতলা, তবু ওকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। আসলে, শরীরে একটু মাংস থাকলে মেয়েদের অনেক খুঁত ঢাকা পড়ে যায়। অনেকদিন পর কথাটা মনে হল আমার।

আমার সলজ্জ স্নান করা দেখে রণেন বলল, তোমাদের যদি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ থাকত, তাহলে এখনই বস্ত্রহরণ করতাম।

অভ্র বলল, না থাকলেও করা যায়। মজা হয়। আয় না, আমরা এই দুজনের সৌন্দর্য পরীক্ষা করি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। যেভাবে বিউটি কুইনদের করে বুড়ো-বুড়ো বিচারকরা।

এই শুনে আমরা দুজনে বাংলোয় ছুটে পালালাম। বিশ্বাস নেই, ওদের মনে কুমতলব জেগেছে। বললাম, শেষকালে ভরদুপুরে দ্রৌপদী সাজতে হবে! এখন কাছাকাছি ভগলুও নেই যে কৃষ্ণ সেজে আমাদের উদ্ধার করবে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হল প্রায় পাঁচটা নাগাদ। অভ্র বলল, এই ভাল, একবার খাওয়া। লেট লাঞ্চ এবং আর্লি ডিনার এক সঙ্গে। যদি ঘুম তাড়াতে চাও, তবে চল একটু তাস খেলা যাক।

আমি ব্রীজ খেলতে জানি না। সুতরাং টোয়েন্টিনাইন খেলা হবে সিদ্ধান্ত হল। কিছুক্ষণ পর তাস জমল না। তখন রণেন বলল, এতগুলো তাস নিয়ে খেলার কোনও মানে হয় না। দুটো তিনটে দিয়ে কোনও খেলা হয় না?

তার মানে ফ্লাশ। জুয়া। জুয়া খেলা আমার একদম পছন্দ না। তবু, সেদিন, ঠিক সেই সময়ে, কেমন মজার ঘোর লেগে গিয়েছিল। আমিও রাজী হলাম। শিখে নিতে বেশী সময় লাগে নি। ঘণ্টাকয়েক খেলার পরে দেখা গেল জয়ী ভীষণ জিতেছে। ওর কাছে কাঁড়ি কাঁড়ি নোট জমেছে। আর অভ্র হারছে। একেবারে দেউলিয়া। জয়ীর কাছে ধার নিচ্ছে। একবার বলল, জয়ী, তোমার কাছে আমার ঋণ বেড়েই যাচ্ছে। কী করে শোধ করব জানি না।

রণেন ফোড়ন কাটে, গায়ে গায়ে শোধ করে দিস। কী বলো—আমরা প্রথম থেকেই সাবধানী। খুব বেশী হারজিত হয় নি। দুজন মিলিয়ে। আমার কিন্তু টাকা জিততে ইচ্ছে করছিল ভীষণ।

এমন সময় অভ্র কিটব্যাগ থেকে একটা বোতল বার করছে দেখে আমিও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।—এটা আবার কী?

—সামান্য একটা জিনিস। ফতুর হয়ে গেছি তো। জমিদারেরা এই অবস্থায় পড়লে মদ খেয়ে সব দুঃখ ভুলে যাবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের বংশধর হিসেবে আমিও, সুতরাং, একটু দুঃখ ভোলার ওষুধ খেতে চাই।

—তুমি একা কেন! জয়ী প্রতিবাদ করল, আমরা সবাই একটু করে খেয়ে দুঃখ ভুলি। দুঃখ বুঝি তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি?

অভ্র বলল, তুমি তো জিতেছ।

মুঠোর মধ্যে নোটগুলো শব্দ করে নাড়তে-নাড়তে জয়ী বলল, টাকা থাকার দুঃখও কি কম!

অভ্র বলল, মেয়েরা বেশী খেয়ো না।

তাসের দিকে চোখ রেখে জয়ী বলল, আচ্ছা, তুমি যে এটা এনেছ আমাকে বল নি তো। আরও আছে নাকি?

—না বাবা, না। এ-জিনিস আর নেই। আমি কি মদ্যপ? আজ যেহেতু একটু মজা-টজা করা হচ্ছে, তাই।

আমরা চারজনে ভাগ করে খেলাম। জিনিসটা ভারি দুঃস্বাদ। আগে আমি কখনও খাই নি ওই সব ছাইপাঁশ। রণেন মনে হয়, মাঝে-মাঝে খায়। মুখ থেকে গন্ধ পাই। চুমুক দিয়ে ও একদম কাঁপল না। অথচ আমি বুঝিই নি এতদিন। ছেলেদের এই একটা সুবিধে। কুকর্ম করে সব ধুয়ে-মুছে আসতে পারে। শরীরে ওদের কোনো ময়লা লেগে থাকে না।

প্রথমটা আমার একটু খারাপই লেগেছিল। তারপর, আসলে মজার ঝোঁকে, চালিয়ে গেলাম। ওরা আমাদের জোর করে সিগরেট খাওয়াল। কী বিশ্রী স্বাদ! কী করে যে ছেলেরা খায়! জয়ীটা আবার ফুকফুক করে ধোঁয়া টানছে কেমন, যেন রোজ খায়!

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করছিলাম। নিজে সবাইকে গেলাশে ঢেলে দিচ্ছিল ঠিকঠাক, কিন্তু মাঝে-মাঝে অভ্র একটু বেশী খাচ্ছিল। বোতলে মুখ দিয়ে। বোতলে মুখ দিয়ে সিনেমার ভিলেনরা খায়, ওটা আমার একদম ভাল লাগছিল না।

খেলা যখন ভাঙা হল, তখন রাত দশটা হবে। বাংলোটুকু ছাড়া আর সর্বত্র অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে, ব্যাঙ ডাকছে। আমরা এতক্ষণ লক্ষই করি নি, এতই মশগুল ছিলাম। টাকা জেতার ঝোঁকে আমিও শেষ পর্যন্ত বেশ হেরেছি। অভ্রর অবস্থা আরও খারাপ। ও যে একেবারে বুদ্ধি খাটায় না। পাগলের মতো দান ফেলে। ও বোধহয় মাতাল হয়ে গেছে, এক সময় আমার সন্দেহ হল।

—চল, এবার শুয়ে পড়া যাক।

—তার আগে চাঁদের আলোয় একটু বেড়ালে মন্দ হয় না। রণেন প্রস্তাব করল।

সত্যি, কলকাতার বাইরে না এলে জ্যোৎস্না দেখা হয় না। এই বাংলোটার চারপাশে প্রকাণ্ড খোলা জায়গা, মাঠ। আর চাঁদের আলো ফুটফুট করছে।

বাংলো থেকে নেমে মাঠে এসে মনে হল, যেন আইসক্রীমের দুধে সাঁতার কাটছি। কানপুরে এইরকম জ্যোৎস্না দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতায়ও নেই। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রণেন বলল, ইচ্ছে করে দৌড়ই। কেউ দৌড়বে আমার সঙ্গে?

অভ্র বলল, ইউ এস আই এস-এ চাঁদের মাটির প্রদর্শনী হয়েছিল, তোমরা গিয়েছিলে কেউ? কালচে রঙের, গঙ্গামাটির মতো দেখতে; খুব ছুঁতে ইচ্ছে করছিল।

ওর গলা কেমন জড়ানো। আমার অস্বস্তি লাগছিল।

ও বলল, আমাদের কত প্রিয় ছেলেবেলার চাঁদ। প্রেম করতে কত সাহায্য করে! আহা, অমন একটা সুদর্শন পিম্প! কিন্তু ওরা ছুঁতে দিল না।

আমি বলতে বাধ্য হলাম এবার: আচ্ছা অভ্র, টাকা না হয় অনেক হেরেছেন, মদও ঢের খেয়েছেন, কিন্তু অন্যদের মেজাজ নষ্ট করছেন কেন? চাঁদের মাটির সঙ্গে জ্যোৎস্নার কী সম্পর্ক?

—একজন প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমের যে-সম্পর্ক। অবলীলায় বলতে পারল ও।

—আপনি বড়ো সিনিকাল। বলতে বাধ্য হলাম শেষ পর্যন্ত।

—জীবনে যে কোনও ঘটনা নেই। কথাটা ও স্পষ্টই উচ্চারণ করল।

ততক্ষণ উজ্জয়িনী আর রণেন চাঁদের আলোয় মাঠের মধ্যে সত্যি ছুটতে শুরু করেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, ওরা পাগল হয়ে গেল নাকি?

অভ্র বলল, যার যা ইচ্ছে করুক। আমাদের বাধা দিয়ে কাজ নেই। চলো, আমরা কোথাও একটু বসি।

বুঝলাম, ওর নড়াচড়া করতে ইচ্ছে নেই।

আমি যেন একটা সম্মোহনের মধ্যে পড়ে গেছি তখন। আমার বুদ্ধি কাজ করছে না। কী ভাল যে লাগছে সব কিছু, আজ আমি বলে বোঝাতে পারব না। হয়তো সব সর্বনাশের পেছনে একটা সম্মোহন থাকে, আমি জানি না।

কলকাতার একঘেয়ে জীবন, সংসার, সারাদিন, দিনের পর দিন একটা রুটিন—প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত, আজ তার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কী ভাল যে লাগছে!

আমরা মাঠের মাঝখানে বসলাম। জয়ী আর রণেনের ছুটোছুটি দেখছিলাম। অভ্র এখন খুব পরিষ্কার কথা বলছে। বলল, ওদের দুজনের চরিত্রে, জানো, কোথায় একটা মিল আছে। বা অমিল যেটা, সেটা সম্পূরক, মানে কমপ্লিমেনটারি, একে অন্যকে ভরাট করে দেয়। অঙ্ক কষে, পয়েন্ট

মিলিয়ে যদি ছেলেমেয়ের বিয়ে হতো, তাহলে, কিছু মনে করো না সোমা, রণেনের সঙ্গে জয়ীকে মানাত বেশ।

আমি উত্তর দিলাম না। কারণ, রণেনকে নিয়ে কোনো নিষ্ঠুর রসিকতা আমার পছন্দ না। রণেন যা, ও তাই। ও আমার।

একটু পরে, যেন ভেবেচিন্তে অভ্র বলল, সোমা, তুমি কিছু মনে করবে, আজ যদি আমরা ওদের দুজনের একটা খেলাঘরের বিয়ে দিয়ে দিই?

—তারপর? ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল।

—তারপর আমরা বুড়োবুড়ি নিজেদের ঘরে ফিরে আসব। ওরা সুখে থাক, আমরা সুখে থাকি।

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিল। অথচ, ওই যে বললাম, মজা পাচ্ছি। মজা ছাড়া আর কোনও অনুভূতি আমার হয় নি। বিশেষ করে অভ্র যখন বলল, 'আমরা বুড়োবুড়ি'—তখন একবার আমি ওর দিকে ফিরে চেয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, সত্যি ওকে বয়স্ক দেখাচ্ছে। আমাদের যৌবন ফুরিয়ে গেছে। আমরা—মানে আমি বা অভ্র—দুজনের কেউই জীবনে কোনও ঝুঁকি নিতে পারব না। হাত-পা ছেড়ে হাসতে বা কাঁদতে পারব না। রণেন আর উজ্জয়িনীর মধ্যে সেই পাগলামি আছে। অভ্র, আসলে, সবচেয়ে কন্‌ভেন্‌শনাল চরিত্র। মুখে যা-ই বলুক না।

অভ্র আমার চুল নিয়ে আঙুলে জড়াচ্ছিল। রণেন আর জয়ী মাঠে ছোটাছুটি করছে তো করছেই। ওদের ক্লান্তি নেই।

* * *

সেই রাত্রির ঘটনা আমি কাউকে কোনওদিন বলি নি। বলবও না। একলা ঘরে অভ্রর সামনে দাঁড়িয়ে আমার ভয় করছিল। ওর গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি, পরনে পাজামা, মুখে মৃদু হাসি। আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হচ্ছিল। ফুলশয্যার ঘরে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে রণেনের আত্মীয়ারা। আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল ওরা খানিকক্ষণ, তারপর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে চলে গেছে। রণেন প্রথম কথা বলল, আমাদের বাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে?

সেদিন রণেনেরও গায়ে ছিল একটা গেঞ্জি, হাতকাটা। খুব সিগারেট খাচ্ছিল। আজ যেমন অভ্র খাচ্ছে।

সেই রাত্রে আমি ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলাম, হুঁ। ওর মন রাখার জন্যে। আসলে আমার কোনও অনুভূতিই হয় নি তখন। একটা ঘোরের মধ্যে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান পার হয়ে ফুলশয্যায় পৌঁছেছি। ভাববার সময় পেয়েছি নাকি?

—আমাকে? এবার রণেন আমার কাছে 'হুঁ' শোনার জন্যেই প্রশ্নটা

শুনে আমার একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হয়। ভাবলাম, বলি, না, হয় নি। কিন্তু পারলাম না। প্রথম রাত—ও তো প্রেম করে নি। হয়তো খুব আঘাত পাবে। মনে-মনে এত প্রস্তুত হয়ে আছে। ওকে আঘাত দিতে আমার কষ্ট হল।

ওব বলেছিল, কী, জবাব দিলে না?

—কী আবার জবাব দেব? আমি ছোট গলায় বলেছিলাম। ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি না, আর কাউকে পাই নি। তুমি আমার প্রথম।...

অভ্র আমার দুটো কাঁধে হাত রেখে বলল, বেশ মজা হল তো! আমরা এখন কী করি বলো তো?

—চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আপনার ঘুম পেয়েছে। আমি বললাম।

আমি জানতাম, আমার মুক্তি নেই। তবু আমি প্রার্থনা করছিলাম, ভগবান, প্রচন্ড ঘুম দাও ওকে। আমাদের দুজনকে। এক্ষুনি। আমি পারব না।

—তা কেন। শুতে গিয়ে ও প্রশ্ন করল।

—আমার লজ্জা করছে। বিছানায় বসে আমি বললাম।

—আমারও করছে। অভ্র যেন টলছে একটু। দাঁড়াতে পারছে না; বলল, তাই রোমাঞ্চও হচ্ছে।

—আমার ভয় করছে।—সত্যি কথাই বললাম। জীবনে কখনো আমি মাতালের মুখোমুখি হই নি তো।

—আমাকে ভয়? অভ্র জিগ্যেস করল—আমার মত এত দক্ষ কারিগর তুমি পাবে না, সোমা। একবার সুযোগ নিয়ে দেখ।

বুঝলাম, আমার আর পরিত্রাণ নেই। আমার ভেতরটা ভিজে উঠছে।

ও বলল, কথাবার্তা বন্ধ করে দাও। এখন শুধু কাজ। বড়ো তেষ্টা পেয়েছে, একটু তোমার দুধ খেতে দেবে? বলে ও আমার বুকে হাত রাখল।

শিশুর মতো কণ্ঠস্বর, কিন্তু হাতে দস্যুর স্পর্শ। দাঁতে বাঘের কামড়, শরীরে পাহাড়ের ভার।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আমার আর কিছু মনে নেই। কখন আমি আচ্ছন্ন বা অচেতন হয়ে গিয়েছিলাম, জানি না। ও বিড়বিড় করে কত কী বলে যাচ্ছিল আর আদর করছিল আমায়। আমি শুনছি না কিছু, আমি স্রোতের মধ্যে একটা শূন্য নৌকোর মতো ভাসছিলাম। এদিক টলছি ওদিক টলছি, কিন্তু ডুবছি না। একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা তুলে টান হয়ে শুয়ে রয়েছি।

অভ্র মিনতি করছে, ভিক্ষে চাইছে। কিন্তু আমি পারব না। আমি রণেনকে ভালবাসি। রণেনের জন্যে আমি সব কিছু ছাড়তে পারি, সব কিছু করতে

পারি। ও আমায় কেন বাঘের মুখে ঠেলে দিল। না কি, পরীক্ষা করছে। করুক, পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হব। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে শরীরে, ততক্ষণ আত্মসমর্পণ করব না। রণেন, তুমি আমার প্রথম, তুমি আমার শেষ।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বাইরে সুইচ টেপার শব্দে আমার জ্ঞান ফিরল। আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম। পাশের ঘর থেকে কেউ বেরুচ্ছে। কারা বেরুল! ফিসফিস করে কথা বলছে। পা টিপে টিপে হাঁটছে। আমি উৎকর্ণ হয়ে ওদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শোনা যাচ্ছে না। ওরা ফিসফিস করে কী কথা বলছে? কী করছে ওরা ওখানে?

রণেন, আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে হল, তুমি কোথায়? তুমি কার সঙ্গে? কেন তুমি আমায় এখানে রেখে গেলে? আমার প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছিল। অভ্র চোখ বুজে আমার পাশে শুয়ে। জেগে না ঘুমিয়ে আমি জানি না। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বাইরে বারান্দায় ফিসফিস কণ্ঠস্বর, ওরা দুজন। হয়তো ওখানেও এইরকম ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে! আমি অনুমান করছিলাম—হয়তো রণেন রাজী হচ্ছে না।

এক সময় জল পড়ার শব্দ হল বাথরুমে। বালতি করে জল রাখা ছিল। তাহলে ওরা বাথরুমে গেছে।

আমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ওদের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবার ওরা ঘুমোবে।

সমস্ত শরীর এবার নিস্তেজ হয়ে এল আমার। এবার আমি ডুবে যাব। আর ভেসে থাকতে পারছি না। আমার ভেতরকার সব ইঁট-কাঠ খসে পড়ছে।

পাশ ফিরে অভ্রর দিকে তাকালাম। ও শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আমি পাশ ফিরতে, মনে হল, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

তাহলে সেও সব শুনেছে, বুঝেছে এতক্ষণে। কী মনে হচ্ছে ওর? কান্না পাচ্ছে? বুক ফেটে যাচ্ছে? ওকে দেখে আমার কষ্ট হল। মায়া হল। আমার মতো সেও বেচারা। বললাম, এসো।

অভ্র বলল, থাক।

কখন ঘুমোলাম জানি না। অনেক ভোরে আমার ঘুম ভেঙেছে। তখনও ফরসা হয় নি। অভ্র অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই অন্য একজনকে পাশে দেখে আমার বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু ওর মুখটা কী নিরপরাধ! সব ঘুমন্ত মানুষই বোধ হয় নিরাপরাধ।

ঘুমোলে ওর নাক ডাকে। আগে জানতাম না। কী করেই বা জানব! খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কীরকম অসুস্থ বোধ হচ্ছে, বমি পাচ্ছে আমার। নিজেকে অশুচি মনে হচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে বসলাম। জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার। নোংরা বাতাস বেরিয়ে গিয়ে বুকটা হাল্কা হল একটু। কলকাতার ভোর আর এই মাঠ ও সবুজে ভরতি গ্রামের ভোর একেবারে অন্যরকম। আমরা যেন বিদেশে বেড়াতে এসেছি। ভোরের হাওয়ায় কেমন একটা রহস্যের গন্ধ। ফুল, পাতা, ঘাস, কাঁচা রোদ্দুর ইত্যাদি সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত নাম-না-জানা গন্ধ। পাশের ঘরে ওরা কী করছে, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার, স্বীকার করছি। কিন্তু পাছে বীভৎস কিছু দেখে ফেলি এই ভয়ে নিরস্ত হলাম।

দূর থেকে কে একজন আসছে এই দিকে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। দুলে-দুলে হাঁটা দেখে বুঝলাম, রণেন। ও তাহলে অনেক আগেই উঠেছে। কোথায় গিয়েছিল ওদিকে? ক্রমশ বড় হতে হতে ও যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় আমার সামনে এসেও থামবে না। আমাকে ছাড়িয়ে মাড়িয়ে পার হয়ে যাবে। পেছনের দেয়াল—বাড়িটা ভেদ করে হাঁটতেই থাকবে।

বারান্দায় উঠে এল সটান। থামল। আমার সামনের চেয়ারটায় বসল। কপালের ঘাম মুছে বলল, ভগলুকে ডেকে এলাম। একটু চা করুক।

ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার একদম ইচ্ছে করছিল না। ওর ভঙ্গি থেকে কেমন একটা অপরাধী ভাব ফুটে বেরোচ্ছিল, যা দেখে আমার রাগ হচ্ছিল, জেগে উঠছিল বিরক্তির কাঁটাগুলো। বিদেশ-বিভুঁই না হলে হয়তো আমার মনের ভাব প্রকাশ করেই ফেলতাম।

—চা খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমি বললাম।

—ঘুমিয়েছিলে?

আমার মুখ দেখে মনের বিমর্ষ ভাব ও আঁচ করেছে। একটু ভয়ও পেয়েছে হয়তো। তবে, ঘুমিয়েছিলে?—এই কুৎসিত প্রশ্নটা করল বলে আমি জবাব দিলাম না।

যা হয়ে গেছে, যে-ক্ষতি আমার মনের চারিদিকে ঘটে গেল, তা না ভেবে, বা না বুঝে, ও এবার জিগ্যেস করল, শরীর ভাল আছে তো?

আবার শরীর? প্রশ্নটা শুনে শরীরটা ঘিনঘিন করে উঠল সত্যি। মনে হল, মাছি বসবে সারা গায়ে; এখুনি স্নান করা দরকার। চুপ করে রইলাম।

রণেন বুঝল, আমি কথা বলতে চাইছি না। তাই চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। পিঠে ঠেস দিয়ে, যেন প্রস্তুত হয়ে এবার জিগ্যেস করল, মন খারাপ নাকি?

জবাব ওকে একটা দিতেই হবে। আমি বুঝতে পারলাম। তবে রূঢ় কিছু না বলে বললাম, না। কেন?

—এমনি জিগ্যেস করলাম। রণেন অপরাধীর মতো বলল। ভেবেছিল, সকালেই সব সহজ হয়ে যাবে। ধুয়ে-মুছে দিলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। তা হল না দেখে ও যেন আশ্চর্য হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ও অন্য কোনও প্রশ্ন করছে না। আমার তো নিজে থেকে কথা বলার প্রবৃত্তিই ছিল না। সুতরাং চুপচাপ। ইচ্ছে না থাকলেও, ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি এক-একবার ওর মুখের দিকে চাইছিলাম। চোখ ফিরিয়ে ছিল রণেন।

বারান্দাময় সিগারেটের টুকরো, ছাই, ছেঁড়া কাগজ, ধুলো, চটচটে দাগ। একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে। টেবিলের ওপর তাসগুলো ছড়ানো। সার্কাসের দল উঠে গেলে মাঠের যে অবস্থা হয়, প্রায় সেই রকম। ও তাসগুলো জড়ো করছিল সমান করে। তারপর রঙ মিলিয়ে সাজিয়ে নিল। শাফ্‌ল করল দু-একবার। চোখ নামিয়ে আছে, আমি ওর মুখের আদলটা দেখছিলাম। আর গলার ভেতরে ঢিল উঠে আসছিল। একটা কথাই হয়তো ঢিল হয়ে উঠে আসতে চাইছিল, যা উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। বলতে চাইছিলাম, তোমাকে দিয়ে দিতে পারব না কাউকে। সে যে-ই হোক। তুমি আমার একার থাকবে।

একটু পরে ও মুখ তুলল। শব্দ করে তাসের বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে পড়তে পড়তে বলল, যাই, স্নানটা সেরে আসি।

বাংলো থেকে বেরোতে বেরোতে দশটা বাজল। ছোটখাট জিনিসপত্র যা ছিল গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাংলোর সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালাম। ভগলু দরজা-জানলা বন্ধ করছে। তালা লাগাচ্ছে। তারপর এক সময় সামনে দাঁড়িয়ে গদ্‌গদ হয়ে বলল, স্যার আপনাদের অনেক কষ্ট হল।

কেউ আমরা মন্তব্য না করায় ও ব্যাখ্যা করতে চাইল, ছেলেটার অসুখ, আমি একদম দেখাশোনা করতে পারলাম না। তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে যোগ করে—দিদিমণিদের কত কষ্ট হয়েছে!

আসলে অভ্রকে উদ্দেশ করেই এত কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলা। বুঝেছে,

গাড়িটা ওর। ও-ই আসলে সাহেব।

অভ্র গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, কেমন আছে আজ তোমার ছেলে?

—জ্বরটা তেমনিই আছে হুজুর।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—এক-আধদিন দেখি হুজুর। হাত কচলাতে কচলাতে ভগলু বলল, জ্বর না নামলে নিয়ে যাব ডাক্তারবাবুর কাছে।

—না, তুমি এখনই নিয়ে যাও। যেন হুকুম করল অভ্র। একটু থেমে কী ভাবল, তারপর পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দিল ওকে।—ডাক্তার দেখাবে, ভাল দাবাই কিনবে, বুঝলে? এক্ষুনি চলে যাও।

খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল ভগলু। এতটা ও আশা করে নি। ভেবেছিল, টাকা পাঁচেক বক্‌শিশ পাবে। তার বদলে করকরে কুড়ি টাকা। একটু বিভ্রান্ত হয়ে অভ্রকে প্রণাম করে বসল হঠাৎ।

—আরে, করো কী! এক লাফে তিন হাত দূরে সরে গেল অভ্র। অপ্রস্তুত। আমরা সবাই হেসে উঠলাম। ভালই হল, সকাল থেকে বড়ো গম্ভীর ছিল আবহাওয়া, একটু পাতলা হল।

আমরা নেমে হাঁটতে-হাঁটতে গাড়িটার কাছে পৌঁছেছি। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বাংলোটা দেখে নিলাম প্রত্যেকেই, অন্যদের বুঝতে না দিয়ে। একবার জয়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার। চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছি সবে, এমন সময় ও-পাশের আড়াল থেকে তিনটে ছেলে উঠে দাঁড়াল। ওদের একজন বলল, নমস্কার।

তিনজনেরই চেহারা রোগাটে ও রুক্ষ। পরনে কালো চোঙা প্যান্ট, ওপরে ঢিলে বুশশার্ট বা পাঞ্জাবি।

অভ্র গ্রাহ্য করল না ওদের। পেছনের দরজা খুলে আমাদের বলল, তোমরা ওঠো।

রণেন, মনে হল, বিপদসঙ্কেত পেয়েছে। মুখটা একটু কাঁচুমাচু করে, করুণ হাসি ফুটিয়ে ওদের দিকে চেয়ে বলল, কী ব্যাপার ভাই!

নমস্কার-করা ছেলেটিই এবার কথা বলল, চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। রণেনের ছোট্ট উত্তর।

—মাত্র একদিন থাকলেন আপনারা!

রণেন বলল, হ্যাঁ, ছুটি কাটানো আর কী! জায়গাটা বেশ ভাল।

দ্বিতীয় ছেলেটি পেছন থেকে মন্তব্য করল, আরও দু-একদিন ফুর্তি করে গেলেন না? এমন নিরিবিলি জায়গা।

তৃতীয় ছেলেটি টিপ্পনী কাটে, বেলেল্লা করার পক্ষে আইডিয়াল।

রণেন অনুমান করেছিল ওরা ঝামেলা করতে এসেছে, তবু কথাটা শুনে

ও এবার থতমত খেয়ে গেল। আমারও বেশ ভয় ধরেছে। বুঝতে পারছি, এরা সহজে যাবে না। একটা কাণ্ড বাধাবেই। পাশে জয়ীর দিকে তাকালাম, ও ভয়ে একেবারে শাদা।

—কী হবে ভাই? ফ্যাকাশে মুখে ও জিগ্যেস করল আমায়।

আমি বললাম, জানি না।

অভ্র গাড়িতে উঠে বসছিল, একটা পা ঢুকিয়েছিল বোধহয়, পা'টা বার করে আনল। শব্দ করে বন্ধ করল দরজাটা। তারপর ও-পাশে এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় তৃতীয় ছেলেটিকে বলল, কী বললে ঠিক বুঝলাম না।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখেও ছেলেরা বিচলিত হল না একটু। প্রথম ছেলেটা বরং দু-পা এগিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে, দাঁড়াল অভ্রর সামনে। বলল, ও কিছু অন্যায় কথা বলে নি। ফুর্তিটুর্তি করে গেলেন মেয়েমানুষ নিয়ে, আমাদের কিছু অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স দিয়ে যাবেন না?

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল অভ্র। ডান হাত দিয়ে ফটাস করে ছেলেটার মুখে একটা ভারী চড় কষিয়ে দিল। হঠাৎ এই চড়টার জন্য ও ঠিক প্রস্তুত ছিল না। উল্টে পড়ে গেল ছেলেটা। ক্ষিপ্র হাতে অভ্র এবার গাড়ি থেকে লোহার হ্যাণ্ডেলটা বার করে আনল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য দুটো ছেলেও পকেট থেকে হাত বার করেছে। হাতে ঝকঝকে ছুরি। সর্বনাশ!

আমরা গাড়ির মধ্যে বসে কাঁপছি।

অভ্র রণেনকে বলল, তুই ওটাকে দেখ, আমি এই দুটোকে সাবাড় করব।

মুহূর্তের মধ্যে রণেনের সংবিৎ ফিরে এসেছে। সময় নষ্ট না করে ও ছুটে গিয়ে পড়ে যাওয়া ছেলেটার ওপর বসল। ভাগ্যিস ও তখনো উঠে দাঁড়ায় নি। আর অভ্র হ্যাণ্ডেলটা বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, এক পা যদি এগিয়েছ, মাথা ফাটিয়ে দেব। শয়তানি করার জায়গা পাও নি?

এতগুলো ঘটনা ঘটল কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ছুরি হাতে থাকলেও ছেলে দুটোর কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। প্রথম ছেলেটা ওদের নেতা হবে, সে তো ছটফট করছে ওঠার জন্যে—রণেনের শরীরের চাপে দাঁড়াতে পারছে না। গালাগালি দিচ্ছে। তাই দেখে হয়তো বাকি দুজন ঝুঁকি নিতে সাহস পেল না। আসলে ওদের গায়ে তেমন জোর নেই। যত দূর মনে হয়, ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা-পয়সা আদায় করতে এসেছিল ওরা। করেছে আগে সম্ভবত। একেবারে যুদ্ধের মুখোমুখি হবে ভাবে নি। তাহলেও আমার ভয় করছিল ভীষণ। কখন কী হয়। একটা খুনোখুনি আজ হবেই। অভ্র বা রণেন কেউই খুন হোক আমি চাই না।

এমন সময় ছুটতে-ছুটতে ভগলু এসে হাজির। কী হয়েছে হুজুর?

এবং ছেলে তিনটেকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—আবার এসেছিস তোরা?

দাঁড়া, আমি এখুনি খবর দিচ্ছি, তোদের ছেনতাই করা বার করছি।

ছোরাসুদ্ধ হাত পকেটে পুরে ছেলে দুটো থুতু ফেলল মাঠে, তৃতীয়জন শুয়ে শুয়েই হাঁকল, যা যা, কী করবি তুই?

—জানিস না কী করতে পারি?

কোনও জবাব না দিয়ে ছোরা হাতে একজন এইবার প্রথম ছেলেটাকে দেখিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, ছেড়ে দাও ওকে।

ভগলু রণেনকে বলল, ছেড়ে দিন স্যার। ওকে ছেড়ে দিন। কিছু করবে না।

রণেন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবার। প্রথম ছেলেটা দাঁড়িয়ে উঠে প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে লাগল। হাঁফাচ্ছে, থুক থুক করে মাটিমাখা থুতু ফেলছে। তারপর কেমন ভয়ে-ভয়ে এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগল ওরা। যাবার সময় বলে গেল, আচ্ছা, দেখে নেব। ফের এসো একবার এই দিকে, জান নিয়ে ফিরতে হবে না।

অভ্র এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও ফুঁশছে। ও চেঁচিয়ে উঠল এবার, পরে কেন, এখনি হয়ে যাক। শিক্ষা হয় নি এতেও?

ভগলু বলল, হুজুর, চুপ করে যান। সব ঠিক আছে।

ব্যাপারটা এত নির্বিঘ্নে মিটে যাবে আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নি। উত্তেজিত স্নায়ু যুদ্ধের আরাম পেল না বলে, সম্ভবত, অভ্র একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তা হোক। আমরা বাকি সবাই নিশ্চিন্ত হলাম। শুধু আশ্চর্য লাগছিল এই ভেবে, ভগলুর কাছে এমন কী বিষ-ঝাড়ার মন্ত্র আছে যে, ওরা হঠাৎ কেঁচোর মতো ঠান্ডা হয়ে গেল হঠাৎ!

সারা রাস্তা আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না। কলকাতায় পেঁছে উজ্জয়িনী হঠাৎ জানাল, এই যাঃ, সানগ্লাসটা ফেলে এসেছি—

তখন আর কোনও উপায় নেই।

রণেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ির সামনে এসে অভ্র গাড়ি থামাল। পথে মণ্টুকে নামিয়ে দিয়েছে অবশ্য। বাড়িতে ঢুকতেই প্রথম চোখাচোখি হল উজ্জয়িনীর সঙ্গে। হতভম্ব হয়ে বসে আছে।

ভর দুপুরে কে আবার বিশেষ দরকারে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ভেবে পাচ্ছিল না। তায় আবার ভদ্রমহিলা। জ্যেঠামশাই মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হল, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। বিষয়সম্পত্তির মীমাংসায় এখনও হাত দেয় নি। ও হবে ঠিক সময়ে। তবু ওর মন থেকে একটা অস্বস্তিবোধ কিছুতেই যাচ্ছিল না। ভদ্রলোক যে-ভাবে মারা গেলেন, বেঘোরে, বেজায়গায়—তা একেবারে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য। জয়ীকে সব ব্যাপারটা ও খুলে বলে নি এখনও। কী প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে, যতক্ষণ কাউকে না বলে থাকা যায়। এ এমন কিছু গৌরব করে বলার কথা নয়। তবে মনে-মনে ওর বিস্ময় ক্রমশ বেড়েই উঠছিল। চুরুট ছাড়া জ্যেঠামশাইয়ের অন্য কোনও নেশা ছিল বলে ও জানত না। আর ওঁর যা ব্যক্তিত্ব ছিল, ছেলেবেলায় ওঁকে যা ভয় করত সবাই, সে সব কথা ভাবলে, ওঁর পক্ষে এই গোপন অপকীর্তি যে করা সম্ভব তা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।

অভ্রর বিধবা মা এবং এই অকৃতদার জ্যেঠামশাইকে জড়িয়ে কিছু রটনা লোকমুখে ও শুনেছিল। খুব ছেলেবেলায় ওর বাবা মারা যান। টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন কিছু। তবে সেই সময় থেকে ওদের দেখাশোনা করা, বিপদে-আপদে হাল ধরা, সব তো তিনিই করে এসেছেন। নিজের সংসার মনে করে। এবং এক বাড়িতে শিশুপুত্র সহ বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও অকৃতদার ভাশুর থাকলে এমনিতেই কিছু মেয়েলী কৌতূহল জেগে ওঠা স্বাভাবিক। তাই থেকে নিশ্চয় এই সব রটনার উৎপত্তি, অভ্র এইরকমভাবে জিনিসটাকে সাজিয়ে নিয়েছিল মনে। মা-ও তো অনেকদিন মারা গেছেন, সুতরাং এই সব রটনার কোনও মূল্য ও দেয় নি। কিন্তু নিজে মারা যাবার সময়ে জ্যেঠামশাই যে কাণ্ড করলেন!...

উজ্জয়িনীর সামনে বসে আছে একজন কালো কোট পরা রোগা মতন ভদ্রলোক। জীবনে কোনওদিন তাকে অভ্র দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তার পাশে কালোপাড় ধুতি পরা এক মহিলা, যাকে ও একবার দেখেছে। বীণা ওরফে বীণাপাণি।

উকিল ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। আপনি অভ্র চৌধুরী? আমার নাম হরিসাধন তরফদার, অ্যাডভোকেট। আর ইনি, এঁকে নিশ্চয় চেনেন,

বীণাপাণি চৌধুরী।

বীণাপাণি চোধুরী! অভ্র মনে-মনে বিস্মিত হল। গণিকাদের মধ্যেও চৌধুরী, মজুমদার, দত্তগুপ্ত এই সব টাইটেল আছে নাকি! ওর ধারণা ছিল, ওই সব মেয়েদের একটাই পদবী হয়—দাসী। বীণাপানি দাসী। ইনি কিন্তু দেখছি চৌধুরী ঘরের মেয়ে!

আলোচনা আরম্ভ করার আগে ও উজ্জয়িনীকে বলল, তুমি একটু ভেতরে যাও। আমাদের দরকারি কথা আছে।

অনিচ্ছুকভাবে উজ্জয়িনী উঠল। যেতে-যেতে ভ্রূ তুলে চাইল ওর দিকে, ইশারা করল। ভাবটা, এরা আবার কারা? চটপট বিদেয় করে দাও।

চোখে-চোখেই অভ্র ওকে আশ্বস্ত করে। উজ্জয়িনী ভেতরে চলে গেলে পর ও অ্যাডভোকেটের দিকে চোখ ফেরায়। লোকটার আপাদমস্তক দেখে নেয় একবার। তারপর ওরই কথার পুনরাবৃত্তি করে, বীণাপাণি চৌধুরী!

—হ্যাঁ, বীণাপাণি চৌধুরী, সুশোভন চৌধুরীর স্ত্রী।

স্ত্রী! অভ্র স্নায়ুগুলোকে ক্রমশ শক্ত করে নিতে লাগল। খুব অলসভাবে সিগারেট ধরাল একটা। হরিসাধনকে অফার করল না ইচ্ছে করেই।

জিগ্যেস করল, তা আমি কী করতে পারি, বলুন?

হরিসাধন নিজের বক্তব্য বেশ গেঁথে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। গড়গড় করে বলল, বীণা দেবী আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছেন। উনিই বলুন।

এবার চোখ তুলে ভাল করে চাইল অভ্র। বীণাকে ও একদিন মাত্র, কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিল। গ্রে স্ট্রীটের কাছাকাছি সেই ফ্ল্যাটে। যেদিন জ্যেঠা-মশাই সেখানে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। ওঁর মৃতদেহ তুলে আনতে গিয়েছিল। লোকসমাজে তো বলা যায় না, জ্যেঠামশাই তাঁর রক্ষিতার ফ্ল্যাটে প্রমোদরত অবস্থায় মারা গেছেন। বাড়ির কেউ আত্মহত্যা করলে লোকে যেমন ঢেকেঢুকে ডাক্তারকে ভজিয়ে ন্যাচারাল ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেয়, এ-বাড়ির ঘটনা তার চেয়ে কিছু তফাত ছিল না। স্বাভাবিক মৃত্যু ঘোষণা না করলে নিন্দে রটবে। আত্মীয় প্রতিবেশীরা হাসাহাসি করবে। নানান রকম গল্প ছড়াবে। তা ছাড়া, সম্পত্তিগত ঝামেলা।

সেদিন রাত্রে নিজেই সে খুব উত্তেজিত ও বিচলিত ছিল। ভালো করে বীণাপাণিকে ও দেখে নি। এ-টুকু মনে পড়ে, সেদিন বীণার পরনে রঙীন শাড়ি ছিল। মাথায় সিঁদুর ছিল, ও অনুমান করছে। আজ দেখছে, কালো পাড় ধুতি, মাথায় ঘোমটা, ঠোঁটে রঙ নেই, একদম অন্যরকম। বিষণ্ণ। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, সেদিনও মনে হয়েছিল তার, আজ আরও বেশী করে মনে হচ্ছে। কোনও কথাবার্তা না বলে বসিয়ে দিলে মাসিপিসি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কথাটা ভেবে ওর একটু হাসি পেল এবার। আবার মনে হল, আচ্ছা, গণিকারাও

তো মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই ওরা কারও মাসি, কারও পিসি এমনিতেও তো হতে পারে।

অভ্র চেয়ে আছে দেখে বীণাপাণিই কথা বলল, তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম বাবা।

বাবা! অভ্রর মন খুব সংস্কারাচ্ছন্ন নয়, তবু কী বিসদৃশ শোনাল কথাটা। মেয়েছেলেটা কী চায়। ও একটু নিস্পৃহ কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কী বিষয়ে বলুন?

—আমি ওই বাসায় আর একা টিকতে পারছি না। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, আসা-যাওয়া করেছেন, খরচপত্র জুগিয়েছেন। এখন আমি কোথায় যাব?

—তা আমি কী করতে পারি, বলুন।

—একটা কিছু বিহিত, ইচ্ছে করলে নিশ্চয় করতে পার।

এবার অভ্র সত্যিই বিরক্ত হল। সঙ্গে উকিল নিয়ে কেউ অনুগ্রহ চাইতে আসে না। নিশ্চয় অন্য কোনও মতলব আছে. মেয়েছেলেটা ভাঙছে না। বেশ ভেবেচিন্তে ও কিছু কাটাকাটা কথা শুনিয়ে দিল এবার।

—দেখুন, আপনাকে আমি চিনি না। আমাদের পরিচিত জ্যেঠামশায় ছিলেন আজীবন অবিবাহিত। সজ্জন, গৃহস্থ, পরোপকারী। তাঁর অন্য পরিচয় আমরা জানি না. জানতে চাই না!

—কিন্তু নিজেই তো তুমি ওঁকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে এলে। এ-ঘটনা তো মিথ্যে নয়, বানানো নয়। একটু থেমে-থেমে স্পষ্টভাবে বীণা বলল।

—হ্যাঁ। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অভ্র অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। আপনি যদি কোনও খবরাখবর না দিয়ে, আমায় লজ্জাকর অবস্থায় না ফেলে, নিজে ওঁর সৎকারের ব্যবস্থা করতেন—

—তা কী করে হয় বাবা? বীণাপাণি যেন আঁতকে ওঠে, বংশের ছেলে থাকতে উনি আমার হাতের আগুন পাবেন? সে কি হয়? তাহলে আমি যে পাতকী হতাম। নরকেও আমার জায়গা হতো না।

সিগারেট নিবিয়ে দিল অভ্র। কনুইয়ের চাপ দিল চেয়ারে। ওঠার ভঙ্গি করল। বলল, যাক, যা হবার হয়ে গেছে, তা নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করে তো লাভ নেই, ও-সব ভুলে যাওয়াই ভাল।

এবার হরিসাধন তরফদার মুখ খুলল। অভিব্যক্তিহীন মুখ।—ভুলে যেতে চাইলেই কি ভোলা যায়, অভ্রবাবু?

প্রথম থেকেই লোকটাকে অপছন্দ করেছে বলে, না অন্য কোনো কারণে, অভ্র জানে না, মনে হল, লোকটার দাঁতগুলো একটু বেশি হলদে। ছোপ-ধরা। অভ্রর মনে হল, ওর মুখে নিশ্চয় খুব দুর্গন্ধ আছে।

—কেন? অভ্র আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

—কারণ সুশোভন চৌধুরী বীণাপাণিকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর বিষয়সম্পত্তি তো ওরই ওপর বর্তাবে। সেই জন্যেই—

—ও, বুঝেছি। এবার অভ্র হরিসাধনের আসার আসল কারণ যেন বুঝতে পেরেছে।

—আমি বিশ্বাস করি না উনি কাউকে বিয়ে করেছিলেন। অভ্র জোর গলায় এবারে প্রতিবাদ করে—কোনও বাজারের মেয়ের ঘরে ক'ঘণ্টা কাটালেই তার সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয়ে যায় না।

কটু কথাটা বলল বটে, কিন্তু বলেই. ওর কানে বিশ্রী ঠেকেছে। অথচ কোনও উপায় ছিল না। এখন ও ব্ল্যাকমেলের সম্মুখীন. জোচ্চুরির মোকাবিলা করছে হিংসায় বিশ্বাসী হলেও এই পরিস্থিতির মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, ও স্থির করল। রাগারাগি করা চলবে না। কথা বলতে হবে স্পষ্টভাবে।

বীণাপাণি কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওর গলা বুজে আসছে। একটু পরে বলল. না. এ-কথা ঠিক নয়।...হ্যাঁ, আমি গেরস্ত ঘরের মেয়ে নই, একথা ঠিক, কিন্তু আজ দশ বছর আমি ওঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনতাম না জানতাম না। দশ বছর আমি ওঁরই সেবা করেছি। বিশ্বাস করো—

অভ্র নিজেকে শাসাল। কাতর হলে চলবে না। তুমি শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, অর্থাৎ আপনি ওঁর রক্ষিতা ছিলেন। তাতে কি সম্পত্তিতে অধিকার জন্মায়?

এবার আবার মুখ খুলল হরিসাধন তরফদার—না, তা জন্মায় না। তবে, যা বলছিলাম. বীণাপাণি সুশোভন চৌধুরীর স্ত্রী। ম্যারেড ওয়াইফ। সুতরাং—

—এ জালিয়াতি। আমি বিশ্বাস করি না।

আলোচনাটা এই জায়গায় পৌঁছবে এক সময়, হরিসাধন তা জানত। তাই, সেই রকম অভিব্যক্তিহীন গলায় জানিয়ে দিল—সার্টিফিকেট আছে।

—জাল সার্টিফিকেট। অভ্র রেগে গেলেও তা প্রকাশ করছে না কথার সুরে। অভ্র জানাল. ইচ্ছে হলে কোর্টে গিয়ে ক্লেম করুন। আমি কোর্টের বাইরে এ নিয়ে কোনও কথা বলতে রাজী নই।

—উইল আছে। হরিসাধন ব্রীফ্‌ড হয়ে এসেছে। অভ্র মনে-মনে বলল, আমিও কাঁচা ছেলে নই। তারপর ওকে বলল—জাল উইল। সব জাল।

—রেজিস্টার্ড।

শুনে এবার ও চমকাল। এত আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে এরা!

—কই দেখি। এবার অভ্র যেন নরম হল একটু। বা কঠিন হল, যাচাই করতে চাইল। সব জাল. ও প্রমাণ করে দেবে, এ-বিশ্বাস ওর আছে।

হরিসাধন কোটের পকেট থেকে দুটো মোটা-মোটা কাগজের তাড়া বার করল। বলল, এগুলো মূল ডক্যুমেণ্টের ফোটোস্টাট কপি। অরিজিন্যালগুলো আমার সেইফ-এ আছে। আপনি নিশ্চয় ওঁর হাতের লেখা চিনবেন। তারপর একটু থেমে যোগ করল—দুটো ডক্যুমেণ্টেরই উইটনেশ আমি। আমার সইও আছে ওতে।

অভ্র মনে-মনে বলল, তুমি হরিসাধন তরফদার একটি আস্ত হারামজাদা। কাগজ দুটো ওর হাত থেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখল। জ্যেঠামশায়ের সই বলেই মনে হচ্ছে। তবে ওর সন্দেহ হয়, দুর্বল মুহূর্তে ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়াও হতে পারে। জাল সইও হতে পারে, কে জানে। ওপর ওপর দেখে কাগজ দুটো ফেরত দিয়ে দিল হরিসাধনকে। ফোটোস্টাট কপি না হয়ে মূল ডক্যুমেণ্ট হলে ও ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলত। তাই ঘোড়েল হরিসাধন তরফদার অরিজিন্যালগুলো নিয়ে আসে নি। ওর সেইফ-এ রেখেছে।

অভ্র এবার মরিয়া। কোর্ট ছাড়া এর মীমাংসা হবার নয়। বোঝা যাচ্ছে, জল অনেক দূর গড়াবে। মেয়েছেলেটা এই বাড়ি ও জ্যেঠামশাইয়ের অন্যান্য সম্পত্তি—কোম্পানীর শেয়ার ইত্যাদি কাগজপত্রের উত্তরাধিকার দাবী করবে। অর্থাৎ অভ্রকে বাড়ি-ছাড়া করবে! কী ষড়যন্ত্র! জ্যেঠামশাই কি এত ক্রূর, জোচ্চোর হতে পারতেন?

—এখন বক্তব্য কী আপনাদের? বীণাপাণির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ল অভ্র। ডক্যুমেণ্ট নিয়ে এতক্ষণ যে-কথাবার্তা হচ্ছিল, বীণা তাতে যোগ দেয় নি। শুনছিল চুপ করে। উশখুশ করে উঠছিল এক-একবার। হরিসাধন কিছু বলার আগে এবার বীণাপাণি জবাব দিল, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি কী করব বলো, বাবা। আমার তো কেউ নেই। ও সবে আমার প্রবৃত্তিও নেই।

এবার বিস্মিত হল অভ্র। এ কোন্ নতুন চাল দিচ্ছে?

—লোকলজ্জার ভয়ে মানুষটা কোনওদিন আমায় ভদ্রসমাজের মুখ দেখাল না।—গলা কাঁপছিল বলতে গিয়ে। শেষকালে কেঁদেই ফেলল বীণাপাণি।

-আমি কিছু বুঝতে পারছি না। অভ্র হাল ছেড়ে দেয়।

এত প্রস্তুত হয়ে আসা সত্ত্বেও বীণাপাণি সব ভণ্ডুল করে দেবে হরিসাধন ভাবে নি। মেয়ে মক্কেল নিয়ে এই হয় মুশকিল হরিসাধন বীণাপাণির দিকে কটমট করে চাইল একবার। বকুনি দিল, এসব কী ছেলেমানুষী হচ্ছে? কাজের কথা বলতে আসা, কাজের কথা বলো। কান্নাকাটি কিসের জন্যে এর মধ্যে?

বীণাপাণি কাঁদছে। চোখ মুছছে বার বার ধুতির কোণ দিয়ে। ধরা গলায় বলল, আমাকে এখনে একটু ঠাঁই দাও এইটুকু ভিক্ষে চাইতে এসেছি। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়ি আমার কিছু চাই না।

শুনে হরিসাধন প্রায় বিমূঢ়। ও রাগে ফুঁসছে। গ্রাহ্য না করে বীণা বলে

চলে, শুধু তোমাদের সঙ্গে একটু থাকতে চাই। তোমাদের সংসারে দাসী-বাঁদী করে রেখ, আমি স-ব সইব। কিন্তু আমাকে ওই জায়গা থেকে চলে আসতে দাও।

বলে দম নিল বীণাপাণি। অভ্র ওর দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে, কথা বলার ভাষা পাচ্ছে না। কাঁদতে কাঁদতে বীণাপাণি বলে চলে, তুমি তো বাবা ওঁকে তুলে এনে মান বাঁচিয়েছ, এই বুড়িটাকে উদ্ধার করবে না? এর পর বীণা যা বলল, তা গণিকার মুখের কথা নয়—আমার কেউ নেই। তবু এই বাড়িতে থাকতে দাও যদি, ওঁর কাছাকাছি থাকতে পাই।

হরিসাধন চোখ রাঙিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল এবার। চেয়ারের হাতলে চাপড় মেরে বলল, এইরকম তো কথা ছিল না। এসব কী হচ্ছে বীণা?

বীণাকে থামানো যাবে না। সে যেন মনস্থির করে ফেলেছে, ওই নোংরা পরিবেশ ছাড়বেই। কিংবা মনস্থির করেই এসেছিল, উকিলকে বলে নি। ভেজা গলায় জবাব দিল, তুমি চুপ করে থাক হরিসাধন। অনেক পয়সা খেয়েছ ওঁর কাছে। আমাকেও সর্বস্বান্ত করতে চাও?

এবার হরিসাধন উঠে দাঁড়ায়। বীণা, বেশী ভালোমানুষী দেখিও না। আঙুল তুলে বলে, তোমাকে তো আমি চিনি।

বীণা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কান্না-ভেজা গলা ওর শুকিয়ে গিয়েছে এক মুহূর্তে। বেশ উঁচু-স্বরে শুনিয়ে দিল হরিসাধনকে, তোমার যা খুশি তুমি করতে পার, উকিল সাহেব। বলতে গিয়ে কাশি উঠে এল ওর, কাশি থামলে বলল, আমি যদি এ-বাড়িতে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাই, কাউকে তোয়াক্কা করি না। যদি না-ও পাই আমি ভিক্ষে করব, কিন্তু ওঁর বংশধরকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব না।

—ঠিক আছে। আমি তা হলে চললাম। হরিসাধন এবার দরজার দিকে পা বাড়ায়। আঙুল তুলে বলে, তোমার যা খুশি তুমি করতে পার, আমায় দায়ী কর না।

অভ্র পিছু ডাকল। ঠিক আছে, কাগজটা রেখে যান। হঠাৎ ওর মনে পড়ায় নিজে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ডেকে বলল হরিসাধনকে, আর শুনুন, অরিজিন্যালগুলো এঁকে পৌঁছে দেবেন। আপনার বিলটাও দিয়ে দেবেন, তারপর দেখা যাবে।

বেরিয়ে গিয়েও ফিরে এল হরিসাধন তরফদার। দরজা দিয়ে ঢুকে বসে-থাকা বীণাপাণিকে উদ্দেশ করে জিগ্যেস করল, নিজে নিজে ফিরতে পারবে তো বীণা?

উকিলের গলায় মমতা? সোনার পাথরবাটি! অভ্র একটু কৌতুক বোধ করে। নাকি মক্কেল যাতে একেবারে হাতছাড়া না হয়ে যায়, তার চেষ্টা? যাই

হোক, অভ্র এর উত্তর দেয়, আপনি ভাববেন না, আমি ওঁকে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করব।

হরিসাধন চলে যাবার পর অভ্র ভাল করে, আবার বীণাপাণির মুখের দিকে চেয়ে দেখল। মন থেকে ওর সন্দেহ যাচ্ছে না। মেয়েছেলেটা কি অভিনয় করছে? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবু বলল, দেখুন, ব্যাপারটা বেশ জটিল। চট করে এর মীমাংসা হওয়া মুশকিল, বুঝলেন কিনা?

—তা হলে? বীণাপাণি এখন একা, অসহায় কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে অভ্র বলল, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন।

অস্বস্তি বোধ করছে ও, আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে, পায়চারি করছে ঘরে।

একটু পরে, সাবধানে আস্তে-আস্তে জানায়, তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, এই কপিগুলো সলিসিটরকেও দেখাব। আর যতদিন না এসপার-ওসপার কিছু হচ্ছে ততদিন—স্নেহস্বরে বলল—আপনার ফ্ল্যাটের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ আমিই চালিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

হাঁটতে-হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল একবার। বীণার দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, তবে যদি ব্যাপারটা জাল প্রমাণিত হয় তবে আমি শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব এর, তাও জানিয়ে রাখছি।

বীণাপাণি বলল, তোমার যা ইচ্ছে তুমি কর বাবা। যেভাবে চাও আমায় পরীক্ষা কর। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলছি তোমায়, জোচ্চুরি আমি করি নি। কোনওদিন করব না। আমি অভাগী, তাই আজ আমার এই দশা।

কী মনে করে অভ্র ভেতরে যাবার জন্যে দরজা অবধি এগোল। বলল, একটু আসছি।

তিনটে বাজে প্রায়। গিয়ে দেখল, উজ্জয়িনী চুপ করে বসে বই পড়ছে। বলল, খেতে দিয়ে দাও। খুব খিদে পেয়েছে। আর একজন আমাদের সঙ্গে খাবেন।

উজ্জয়িনী শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল খাবার যোগাড় করতে। একবার বসার ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল বীণাকে। জিগ্যেস করল, কে গো এই ভদ্রমহিলা?

বসার ঘরে ফিরে যেতে-যেতে অভ্র ফিসফিস করে উত্তর দেয়—পরে বলব। এখন কিছু জানতে চেয়ো না।

কেন যে অভ্র লুকোচুরি করছে বুঝতে পারে না উজ্জয়িনী, ব্যাপারটা মৃত জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে জড়িত, তবে সেটা কী, বিশদভাবে ওর জানতে ইচ্ছে। উনি চলে যান, তারপর চেপে ধরবে অভ্রকে। না বলে যাবে কোথায়?

মৌরীকে স্কুলে পেঁৗছে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাঝে-মাঝে একজন লোককে প্রায়ই লক্ষ করে সোমা। বুড়ো মতন, একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, ঘাড় অবধি নামানো চুল। বেশীর ভাগই পাকা। লোকটা কীরকম চোখ করে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ ওর পিছু-পিছু আসে। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। রাস্তায় ঘাটে এই প্রকৃতির লোক অবশ্য আকছারই দেখা যায়। এক ধরনের লোক আছে না, যারা যে-কোনও বয়সেই মেয়েমানুষ দেখলে ড্যাব-ড্যাব করে চায়। নির্লজ্জের মতো? যেন গিলছে। যেন কাপড়চোপড় ভেদ করে শরীরের ভেতরটা দেখছে। যেন তারও ভেতরে মেয়েমানুষের ফুসফুস, যকৃৎ, পাকস্থলী, জরায়ু—সব চোখ ঢুকিয়ে দেখে নিচ্ছে। মরা গরুর পেটের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে শকুন যেমন ভেতরটা তদন্ত করার পর পচা মাংসটা খায়। মাংস খাবার লোভ এইসব লোকেদেরও থাকে নিশ্চয়, তবে সভ্য সমাজে তা তো সম্ভব না। তাই শুধু চোখের খিদে মিটিয়ে আপাতত শান্ত হয় এরা। সোমার ভয় করে এই ভেবে যে, লোকটা যদি কোনদিন ওকে নির্জন জায়গায় একা পায়, তবে এমন কিছু বলবে বা করবে যা ও কল্পনাই করতে পারে না। এই কথা ভাবলে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও ওর সমস্ত অন্তরাত্মা হিম হয়ে যায়।

কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে ওকে বলেছিল, আচ্ছা মেয়েদের কি পেছনেও দুটো চোখ থাকে? তা না হলে কী করে বোঝেন, পেছন থেকে কেউ আপনার দিকে চেয়ে আছে! আপনি একা নন, সব মেয়েরাই। ছবি দেখতে গিয়ে ইনটারভালের সময় আমি হয়তো সামনের রো-এ একজন সুশ্রী মহিলাকে দেখলাম, দেখতে ভাল লাগল। ক্রমশ একটু বেশী মন দিয়ে দেখতে থাকলাম, অমনি কিছুক্ষণ পরে সে পিছন ফিরে চাইবে, চোখাচোখি হবে; হবেই।

—ইনটুইশন। সোমা বলেছিল, ইনটুইশন ছাড়া আর কী। নেকড়ের জঙ্গলে হরিণের মতো আমাদের চলাফেরা করতে হয় তো। সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে চলতে এই ব্যাপারটা এসে যায়, আপনিই।

যে-লোকটার কথা এক্ষুনি ভাবছিল সোমা, তার সঙ্গেও প্রথম চোখাচোখি হয় এই ভাবে। কী মনে হতে পেছন ফিরে দেখে, একজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই লোকটা অন্য দিকে হাঁটা দিল।

মৌরীকে স্কুলে পেঁৗছে দিয়ে বাড়ি ফিরছিল সোমা। হেঁটেই। কতটুকুই বা রাস্তা! পথে বইয়ের স্টল পড়ে। একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দু-একটা

পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল। ভাবছিল, একটা কিনবে কিনা। ইতস্তত করছে, এমন সময় পিঠের কাছে সুড়সুড় করতে লাগল ইনটুইশনটা।

তখন ন'টা বাজে। রাস্তায় আপিসযাত্রীর ভিড়। কারও এদিক ওদিক চাইবার সময় নেই। তারই মধ্যে অপর ফুটপাথে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সেই আধবুড়ো লোকটা।

চোখে চোখ পড়তেই লোকটা এবারও অন্য দিকে হাঁটা দিল। মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। একটু অস্বস্তিবোধ নিয়ে সোমা ঢুকল গড়িয়াহাট বাজারে, দু-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যাবে। কলা, মুসুম্বি, আধখানা পাঁউরুটি।

কেনাকাটা সেরে বাজার থেকে বেরুল। একবার ভাবল, ট্রাম-বাস কিছু ধরে বাড়ি ফিরবে। যদিও তিনটে মাত্র স্টপেজ। তারপর আবার খানিকটা হাঁটা। স্টপেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ওঠার উপায় নেই। আপিসযাত্রীর ভিড়। এগারোটার আগে কমবে না, ও বুঝল। তখন, কী আর করে, একটা রিকশা ধরবে স্থির করল। দর-কষাকষি করছে রিকশাওলার সঙ্গে, এমন সময় ওর আবার চোখ পড়ল পাশের ওষুধের দোকানটায়। সেই লোকটা দোকান থেকে ওকে দেখছে একদৃষ্টে।

সঙ্গে-সঙ্গে ও রিকশায় চড়ে বসল। পাছে লোকটা বাড়ি অবধি ধাওয়া করে, সেই ভয়ে রিকশা ঘুরিয়ে ও ডোভার লেনের দিকে বাঁক নিল। তারপর অনেক ঘুরে, পণ্ডিতিয়া রোড হয়ে, আবার রাসবিহারী এভিন্যু ধরে বাড়ি ফিরল। বার বার পিছন ফিরে চাইছিল, কিন্তু লোকটাকে আর দেখা যায় নি। বাড়ি ফিরে এসে দেখে, রণেন বেরিয়ে গেছে। তখন দশটা বাজে প্রায়।

প্রমীলা জিগ্যেস করেছিলেন, তোমার এত দেরি হল ফিরতে?

ও কিছু বলে নি, কী আর বলবে? একটা লোক আমার পিছু নিয়েছিল, একথা তো ঠিক বলা যায় না। সত্যি তেমন কিছু তো ঘটে নি। সত্যি কথা বললে, বলতে হতো, একটা লোকের সঙ্গে বার বার চোখাচোখি হয়ে গেছে, অনিচ্ছাকৃতভাবে। এটা হাস্যকর যুক্তি। ও বলেছিল, দু-একটা জিনিস কিনলাম, তারপর রিকশা পাচ্ছিলাম না।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যেত যদি লোকটার সঙ্গে আবার না দেখা হতো। কিন্তু তা হল না। কয়েকদিন পর আবার ওই রকম মৌরীকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে, হঠাৎ লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি। সেদিন ও উল্টোপথ ধরে এদিকে আসছিল। মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল একবার। শ্যেন-দৃষ্টি ফেলে ওকে দেখল। যেন চেটে খাচ্ছে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

রাস্তায় ঢের লোকজন। সোমা ঠিক করল, ফের যদি সে ওর সামনে দিয়ে

পার হয়, ও ঠিক বলে উঠবে, শুনুন। লোকটা থমকে দাঁড়াবে। তখন সোমা জিগ্যেস করবে, কী ব্যাপার বলুন তো! রোজ-রোজ আপনি আমার পিছু নিচ্ছেন কেন? কী বলবে সে তখন? কিছু না, পালাবার চেষ্টা করবে। তখন ও রাস্তার লোক ডেকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। শিক্ষা হওয়া দরকার এই জাতের মানুষদের।

কিন্তু পারে নি। সাহসে কুলোয় নি, সৌজন্যে বেধেছে। আবার ভেবেছে, লোকটা যদি হঠাৎ বলে বসে, কী ভাবেন আপনি নিজেকে? যে আপনি ছাড়া দৃশ্য নেই রাস্তায়? পৃথিবীসুদ্ধ লোক শুধু আপনার মতো একজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে রয়েছে কাজকর্ম ভুলে? সত্যি তো, ও তেমন ডাকসাইটে সুন্দরী নয়। সুতরাং রাস্তার লোকেদের কাছে ও কোনও প্রামাণ্য যুক্তি খাড়া করতে পারবে না। ওরা হেসে চলে যাবে। লজ্জায় পড়বে সোমাই। এই জাতের লোকেরা ভেবেচিন্তেই পথে বেরোয়।

গত তিন-চার মাসে অন্তত বার দশেক এমনি চোখাচোখি হয়ে গেছে, ও তবু কিছু বলে নি। লোকটা একটু দূর পর্যন্ত এসেই ফিরে গেছে। সুতরাং ওকে সোরগোল করার সুযোগই দেয় নি।...

আজ মৌরীকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল সোমা। আসতে-আসতে হঠাৎ ওর মনে পড়ল, একটা জিনিস কিনতে হবে। আজ-কালের মধ্যেই দরকার হবে। আগের প্যাকেটটা গত মাসে ফুরিয়ে গেছে।

সোজা এগিয়ে না গিয়ে ও রাস্তা পার হল। মৌরী ওর হাত ধরে। জিনিসটা কিনল। ফুটপাথে নেমেছে, এমন সময় পাশে খেলনার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মৌরী।

—আমায় এই রেলগাড়িটা কিনে দাও।

—কী দুষ্টুমী করছ রাস্তার মাঝখানে! সোমা টান দিল ওর হাত ধরে।

—আমার যে রেলগাড়ি নেই একটাও। মৌরী নাছোড়বান্দা, এটা আমি নেব, আমি নেব, এই লাল রেলগাড়িটা।

মৌরীটা এই রকম। একবার যদি জিদ চাপে তো ছাড়বে না চট করে। সব ঠাকুমার আদরে হয়েছে—সোমা মনে-মনে গরজায়।

দোকানী আরও শয়তান। সে ততক্ষণে ওর সামনে যাবতীয় খেলনা হুড়-মুড় করে বার করেছে। ট্রামগাড়ি, দোতলা বাস, হাঁড়িকুঁড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন, ওর যা আছে।—কোন্‌টা চাও খুকী!

—কেন আপনি ওকে লোভ দেখাচ্ছেন? সোমা ঝাঁঝিয়ে উঠল দোকানীকে। ছেলেমানুষ দেখে সুযোগ নিচ্ছেন কেন? বেশ জোরে টানল মৌরীকে। বলল, তোমার ঢের খেলনা আছে। কিছু চাই না এখন।

নাকি সুরে মৌরী দাবী জানায়—হ্যাঁ চাই, আমার রেলগাড়িটা চাই।

আমি রেলগাড়ি চড়ে মামার বাড়ি যাব।

ঠিক এই সময় ইনটুইশনটা মাথা চাড়া দিয়েছে সোমার। পিছন ফিরে চাইতেই দেখে, ঠিক। সেই বুড়ো লোকটা। চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, দিন না, এত করে চাইছে।

এত কাছে লোকটা, ওর গা ছমছম করে উঠেছে। মুখে কেমন যেন বিচিত্র একটা হাসি।

—দিন না, এত করে যখন চাইছে। লোকটা আবার বলল। মৌরীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করল, রেলগাড়ি চড়ে তুমি মামার বাড়ি যাবে খুকী?

—হ্যাঁ। কথা বলার লোক পেলে মৌরীকে কে থামায়!

—কোথায় তোমার মামার বাড়ি, খুকী? লোকটা সুর করে জিগ্যেস করে।

—খুকী না, আমার নাম মৌরী।

—আচ্ছা আচ্ছা। মৌরী, তোমার মামার বাড়ি কোথায়? জানো তুমি?

—লোকটা কথা চালিয়ে যাচ্ছে, এদিকে সোমার বিরক্তির শেষ নেই।

—কানপুর। মৌরী বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দেয়, জানো আমি এই রেলগাড়িতে চড়ে কানপুর যাব। ক্যু-ঝিকঝিক, ঝিকঝিক, ক্যু-কানপুর জংশন, কুলি কুলি, মামার বাড়ি আ গিয়া—

লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, হাত বাড়িয়ে আদর করল মৌরীকে, কী মিষ্টি মেয়ে—

অগত্যা ওকে কাটাবার জন্যে সোমা রেলগাড়িটা কিনে দিল। তারপর তড়িৎগতিতে একটা রিকশায় উঠে পড়ল। বলল, চলো লেক রোড। জল্দি।

লোকটা সব দেখেছে, সব শুনেছে, কিছু বলে নি। একটু এগিয়ে যাবার পর নিরাপদ ভেবে যখন সোমা পিছন ফিরল, দেখল, লোকটা তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য!

স্থির করল, বাড়ি ফিরেই বিস্তৃত ঘটনা খুলে বলবে সবাইকে। প্রথম দিনের ঘটনা থেকে। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত লাগছে।

রিকশা থেকে নেমে ঢুকতে যাচ্ছে, দেখে বাড়ির সামনে একটা চেনা গাড়ি দাঁড়িয়ে। সুবীরের গাড়ি।

সুবীরকে বসার ঘরে দেখে ও রাস্তার ঘটনা বলতে ভুলে গেল। সামনের চেয়ারে প্রমীলা বসে। ও'রা কথা বলছেন।

গাড়িটা তো আগেই দেখেছে, তবু ও আশ্চর্য হবার ভান করল একটু— আরে সুবীর যে, কী খবর? অনেকদিন পর—

—এই এলাম। কেমন আছেন আপনারা!

সোমাকে প্রমীলা বললেন, বোসো।

মায়ের হাত ছেড়ে মৌরী চলে গেল ভিতরে। পিসির কাছে। ও'দের মধ্যে

বেশ ভাব হয়ে গেছে। বলল, দেখ পিসি, কেমন রেলগাড়ি। এতে চড়ে আমি মামার বাড়ি যাব। ক্যু-ঝিকঝিক, ঝিকঝিক—

পিসির সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আরও কী কথাবার্তা হল, বাইরে-ঘরে যারা বসে, অর্থাৎ মা, ঠাকুমা আর পিসির বর, তারা শুনতে পেল না। ওরা তখন অন্য কথা বলছে।

আগের আলোচনার জের টেনে প্রমীলা বললেন, অনু এখন ভালই আছে। তিন মাস হল, একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখছেন. বলছেন হাঁপানি নয়. ইউসনোফিল না কী অন্য অসুখ। এ-অসুখ সারে। আরও দু-তিন মাস ও'র চিকিৎসায় থাকলে একদম সেরে যাবে। বলেছেন মন ভাল রাখতে। তা বাবা, বাপের বাড়িতে কোনও সধবা মেয়ের কি মন ভাল থাকে? নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে—

একটু ইতস্তত করে সুবীর বলল. ইচ্ছে করলে ও তো ফিরে যেতে পারে। অন্তত কিছুদিন থেকে আসতে পারে। অবশ্য ওর যদি ইচ্ছে হয়, আমি কোনও জোরাজুরি করতে চাই না।

প্রমীলা বললেন, আরও কিছুদিন থাক। চিকিৎসাটা শেষ হোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে সুবীর একমনে সামনের ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা দেখছিল। ক্যালেন্ডারের ছবিটা। এক সময় বলল, অনু বাড়ি নেই?

প্রমীলা বললেন, আছে তো, দেখি কী করছে।—

সোমাকে বসিয়ে রেখে প্রমীলা উঠে গেলেন।

সোমার কোনও কথা নেই সুবীরের সঙ্গে। সুবীর তো অনুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

একটু পরে অনু ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল।

—কেমন আছ? সুবীর প্রশ্ন করল।

ঠিক এই সময়ে পাশের বাড়ি থেকে গোলমালটা শোনা গেল। পাগলটা চিৎকার করছে : এ তো বাড়ি না. কশাইখানা। এ-বাড়ির অন্ন যে খায় সে গোমাংস খায়।

সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা-কণ্ঠ ঝনঝন করে ওঠে।—আবার! আবার তুমি এই কাণ্ড করেছ?—ফটাশ ফটাশ। বলো, আর কখনও করবে?

—আবার করব। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন করব। পাগলটার গলা। মেরে ফেল, মেরে মেরে আমায় মেরে ফেল্ তোরা। আমি বাঁচি, সবাই বাঁচে। বাড়ি নয়, এটা কশাইখানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনু আর সুবীর এইসব কথোপকথন শুনল মন দিয়ে। তারপর অনু বলল, একটা পাগল। চেন দিয়ে বাঁধা থাকে। মাঝে-মাঝে চেঁচায়। ওর স্ত্রী ওকে মারে, তবে ঠাণ্ডা হয়। ওদিকে মন দেবার দরকার

নেই।

অনু সুবীরের দিকে চোখ ফেরাল, তোমার আপিস নেই আজ?

—কামাই করলাম। সুবীর আবেগহীন গলায় উত্তর দেয়।

—হঠাৎ কামাই করলে তুমি? বস্ কি ট্যুরে গেছে নাকি?

—ঠিক তা নয়, হঠাৎ মনে হল, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

এবারও ওর গলায় কোনও আবেগ নেই। সোমার মনে হল, ওর উপস্থিতির জন্যে ওরা মন খুলে কথা বলছে না। এবার ওর উঠে পড়া উচিত। ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলুক। একটা মীমাংসা যদি হয়ে যায় এই ভাবে, হোক। ও যেন বাঁচে।

বলল, সুবীর তুমি বোসো, আমি একটু আসছি।

বলে উঠে দাঁড়াল সোমা। ভেতরের দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার আগে ঘুরে দাঁড়াল একবার। বলল, আর শোনো, যদি তোমার খুব আপত্তি না থাকে—

—না না। ঠিক আছে। সুবীর বুঝেছে, খাবার কথা বলছে সোমা। বলল আমার জন্যে একদম ব্যস্ত হবেন না। আমার বাইরে খাবার নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। এখান থেকে সোজা সেখানেই যাব।

আর কিছু না বলে সোমা ভেতরে চলে গেল।

সোমা উঠে গেলে পর সুবীর আবার প্রশ্ন করল অনুকে—কেমন আছ, জিগ্যেস করলাম, জবাব দিলে না?

—ভালই আছি।

—মা বলছিলেন, একজন হোমিওপ্যাথ দেখছেন তোমায়—

—হ্যাঁ। কাজ হয়েছে।...

—বলেছেন, মন ভাল রাখতে? এখানে তোমার মন ভাল আছে!

—না থেকে উপায়? অনু মেজে থেকে একটা ছোট খেলনা কুড়িয়ে নেয়। মৌরীর খেলনা, এখানে ফেলে গেছে।—নিজের বাপের বাড়ি, কেউ তো আমায় চলে যেতে বলবে না। অন্য দিকে চেয়ে কথাটা বলে।

—তোমার রাগ এখনও যায় নি দেখছি। সুবীর চেয়ারের হাতলে একটা টোকা দেয়—এর আগে দু-তিনদিন এসেছি, সন্ধ্যেবেলা। দাদার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে দেখা করে গেছি, তোমার সঙ্গে দেখাই হয় নি। এবার গলায় একটু মমতা ফোটে ওর—আজ তাই ভাবলাম, দুপুরের দিকে যাই, যদি দেখা মেলে—

—হঠাৎ এত টান? অনু খেলনাটা নাড়তে নাড়তে মুখ নিচু করেই প্রশ্নটা করল।

মেয়েদের শরীরে বল নেই, কিন্তু মুখে হুল থাকে বেশ। ছুঁচের মতো ছোট-ছোট তীর দিয়ে ওরা যুদ্ধ করতে জানে। অনু হুল ফোটাচ্ছে। সুবীর খানিকটা প্রস্তুত হয়ে এসেছে অবশ্য। বলল, সত্যি, নিজেই আমি অবাক হচ্ছি।

হঠাৎ একটা টান--

—তোমার নিজের শরীর ভাল আছে তো? অনু প্রসংগ বদলাবার চেষ্টা করে।

—আছে একরকম। তবে মন ভাল নেই।

—কেন, কী হল আবার মনে? এখন তো আপদ গেছে, এখন তো স্বাধীন, ফ্রী—

সুবীর হাসল। মনে-মনে বলল, কামড়াও, যতক্ষণ না বিষ শেষ হয়, কামড় দিয়ে যাও। অনেক কষ্ট পেয়েছ। বলল, আপদ! না, যায় নি।

—কেন? নতুন কোনও আপদ জুটিয়েছ নাকি আবার?

—আপদ যায় না। একবার এলে আর যেতে চায় না,—সুবীর অনুর চোখে চোখ রেখে বলল, কাঠঠোকরার মতো গাছের কোটরে বসে থাকে, আর মুখ বার করে গাছটাকেই ঠোকরায়।

—তা, আমায় কি কিছু বলতে চাইছ? কিছু বলতে এসেছ আজ? এগোতে না পেরে বেশ কঠিন স্বরে অনু প্রশ্ন করল।

--তোমাকে নিতে এসেছিলাম। যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে। তা মা বললেন, আরও দু-এক মাস যাক, চিকিৎসাটা শেষ হোক।

'নিতে এসেছিলাম' শুনে অজান্তেই বুকের কাপড় ঠিক করল অনু। বলল, তারপরেও আমি যাব না। অনুর গলা কঠিন হয়ে বাজল, তুমি ঠিক সময়ে ডিভোর্সের জন্য মামলা করো।

—তোমার রাগ এখনও যায় নি। সুবীর মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বলছে, বেশ ভেবেচিন্তে।—জানো, আইনে ডিভোর্সের মামলার আগে স্বামী আর স্ত্রীকে বেশ কিছুদিন আলাদা থাকতে হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যেই পরীক্ষা হয়ে যায় বিরোধটা কী রকম। সাময়িক না দীর্ঘ-স্থায়ী। আমার দিক থেকে ঝগড়াটা ছিল সাময়িক, বুঝতে পেরেছি ক্রমশ। তোমার দিক থেকে—

অনু খেলনাটা সামনের টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল। বলল, পারমানেণ্ট।

—তাই নাকি? তা হলে কিছু বলার নেই। সুবীরের গলায় নৈরাশ্য। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, বেশী দোষ যখন আমার, কষ্ট যখন আমিই দিয়েছি বেশী—

একটু থেমে রুমাল বার করে মুখটা মুছল। রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে কথাটা শেষ করল, তবু ভেবে দেখো। একদিন হয়তো মত বদলাবে—

—দেখেছি। ঢের দেখে দেখে তারপর বেরিয়ে এসেছি, আর উপায় ছিল না বলে।

এবার সুবীর বোঝাবার চেষ্টা করে অনুকে।—মানুষের মন তো বদলায়!

—জীবন বদলানো যায় না। অনুর গলা ভারী শোনাচ্ছে।

—সুযোগ পেলে তা-ও হয়তো বদলায়, না পেলে বদলায় না। সুবীর জবাব দেয়। একটু ভেবে বলে, বেশ কিছুদিন থেকে আমার ব্লাডপ্রেশারটা আবার বেড়েছে। পিল খেয়েও ভাল ঘুম হচ্ছে না। ভাবছি, চাকরিটা ছেড়ে দেব।

—ইচ্ছে হয় দাও। তবে, এত সাধের চাকরি তোমার—

—জীবনের চেয়ে বড়ো নয়। এখন ভেবে দেখছি, সব ভুয়ো—

—নতুন কথা শোনাচ্ছ। সুযোগ পেয়ে অনু নিষ্ঠুর হচ্ছে।

—নতুন জিনিস শিখলাম তুমি চলে আসার পর। সুবীর নিজের অসহায়তা গোপন রাখে না আর : ভেতরে-ভেতরে আমি বাঁধা পড়ে যাচ্ছিলাম। জীবিকা আমার জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছিল। ঠুলি পরিয়ে আমায় দিয়ে ঘানি টানাচ্ছিল। আমি টানবো না।

তারপর জোর দিয়ে বলল, কোনও মানে হয় না, চাকরির জন্য জীবন দেওয়ার।

পকেট থেকে রুমালটা আবার বার করে, মুখ মোছে। রুমালটা পকেটে পুরে রেখে আবার বলে, আজ যদি আমি মরে যাই, পঙ্গু হয়ে যাই, চাকরি আমায় ফুলের মালা দিয়ে পুজো করবে না। বরং সুস্থ লোককে একস্‌প্লয়েট করে। প্রাঞ্জল করার জন্য যোগ করে—মুসলমানের মুর্গী পোষা—

—যাই হোক। আমি এখানে বেশ আছি। একটা চাকরি-বাকরি পাবো আশা করি, অনু বলল। তা হলেই আর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না। তুমি কিছু না দিলেও চলে যাবে তারপর।

—আমার কিছু বলার নেই। সুবীর হাল ছেড়ে দেয়। উঠে পড়ে; যেতে-যেতে বলে, এইটুকু অনুরোধ, আর একবার ভেবে দেখো। আজ চলি।

সুবীর চলে গেল। দু-চারটে করকরে কথা ওকে শোনাতে পেরেছে অনু—ভেবে বেশ ভাল লাগছে। প্রতিশোধ। এখন দরকার পড়েছে তাই কাতর মুখ করে ভেজা বেড়ালের মতো সুড়সুড় করে এসেছেন। কোথায় গেল বন্ধুবান্ধব? তারা এসে সেবা করুক না! আমার শিক্ষা হয়েছে ঢের, অনু মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল, আমি আর ফিরছি না।

এক সময় স্টার্ট দিল গাড়িটা। সুবীরের গাড়িটা। অনু বেরোল না। তবে উৎকর্ণ হয়ে ওর চলে যাওয়ার পরিচিত শব্দটা শুনল, যতক্ষণ শোনা যায়।

—এখন কী করা যায়, বল তো? অভ্র রণেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

দুজনের সামনে দু-কাপ চা। কলেজ স্ট্রীট পাড়া। ওয়াই এম সি এ-র পেছন দিকের রেস্তোরাঁ। ছুটির সকাল। ওরা একটা পর্দা-ঢাকা কেবিনের মধ্যে ঢুকে বসেছে।

কাল ফোন করেছিল রণেন। আপিস থেকে আপিসে। পরের দিন ছুটি আছে কিনা জানতে।—বাড়িতে থাকবি, সকালের দিকে যাব। আড্ডা মারা যাবে।

—আয় না, চলে আয় সকালে, আমার কিছু করার নেই। অভ্রর গলায় উৎসাহ। তারপর একটু ভেবে বলেছিল, এই, এক কাজ করবি?

—কী।

—কাল আমার বাড়িতে না এসে চল্ আমরা বাইরে কোথাও মীট করি। এই ধর, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। গাড়ি বার করব না, বাসে করে যাবো। কফি হাউসে যাবি? তুই আর আমি, সেই আগেকার মতো?

মাঝে-মাঝে অভ্রর এই রকম পাগলামি চাপে। হঠাৎ ওর আগের দিন-গুলোয় ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়। যেন লাফ দিলেই যাওয়া যায়! এতই সহজ! তবু রণেন আপত্তি করল না। —ঠিক সাড়ে দশটা, মনে থাকবে তো?

অনেকদিন পর এই পাড়ার সকাল। কতকাল ওরা এ-অঞ্চলের পথ মাড়ায় নি। গত দু-তিন বছর তো ছুরি আর বোমার ভয়ে, ওরা কেন, অনেকেই এ-দিকে ঢুকতো না। কে ভেবেছিল, কলকাতায় আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরবে। অন্তত লোকে নির্ভয়ে হাঁটাচলা করতে পারবে।

কফি হাউসে ঢোকার আগে চারপাশ ভাল করে ঘুরে দেখল রণেন। সেনেট হল তো আগেই ভেঙেছে, চোখে সয়ে গেছে ওটা। তাছাড়া আর কিছুই তেমন বদলায় নি। সেই রেলিঙের ওপর পুরনো বইয়ের দোকান। মহাভারত, শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাশে কোকশাস্ত্র, মেটিরিয়া মেডিকা, পাশাপাশি হলুদ মলাটের ওপর কালো কালি দিয়ে লেখা 'গোরা', 'পতিতার প্রেম', 'গ্লাস টেকনলজি', দু-একটা বইয়ের মূল মলাট এখনও বজায় আছে। পায়চারি করতে-করতে জায়গাটার গন্ধ শুঁকলো রণেন, অনেকক্ষণ ধরে। কিছু বদলায় নি। ডান-দিকের বইয়ের দোকানগুলোর সাইন বোর্ডগুলো পর্যন্ত তেমনি আছে। মলিন, জীর্ণ, রঙ-ওঠা। হয়তো এতদিনে অনেক দোকানে বুড়ো মালিকের বদলে তার যুবক ছেলে বসে হিসেব কষছে। কিংবা যুবক দোকানী বুড়ো হয়ে বসে

আছে। কতদিন, বছরের পর বছর এইসব রাস্তায় ওরা হেঁটে হেঁটে সকাল-সন্ধ্যে কাটিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

কফি হাউসে ঢুকতে ইসমাইলকে দেখল। সেই সিগারেটের দোকানটা সিঁড়ির তলায়, দোরগোড়ায়। কী শাদা হয়ে গেছে ওর চুল। এত বুড়ো হয়ে গেছে ইসমাইল! ও কি রণেনকে চিনতে পারবে? কী ভেবে রণেন এক প্যাকেট সিগারেট চাইল। ফিলটার উইলস। ইসমাইল না তাকিয়েই বলল, কুড়ি নয়া খুচরো দিন।

—খুচরো নেই যে। তাহলে তুমি আটটাই দাও।

নতুন প্যাকেট খুলে দুটো সিগারেট বার করে ইসমাইল প্যাকেটটা তুলে ওর হাতে এগিয়ে দিল। একবার বুঝি চোখাচোখি হল। চিনল না। চিনলে নিশ্চয় বলত, আপনি তো ক্যাপস্টান খেতেন আগে। রণেন এইটা শুনবে প্রত্যাশা করেছিল।

না, ওর দোষ নেই, কত লোক আসে যায়, কত মুখ ও মনে রাখবে! বা হয়তো মুখ চেনে কারো কারো। কিছু বলে না। ব্যবসা করছে ইসমাইল। জীবিকা। ওর কোনও নস্টালজিক অনুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক।

ময়লা দেয়াল, কোণ-ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে রণেন ওপরে উঠে গেল। ভেতরে ঢুকলো। বেশ ভিড় আছে। টেবিল-চেয়ারগুলো পর্যন্ত বদলায় নি। বেয়ারারা ঘুরঘুর করছে, মাথায় পাগড়ি। পুরনো কেউ আছে নাকি এখনো? ওর জানতে ইচ্ছে হল।

মনে পড়ল সেই সময়ের কথা। কোন্ বছর? ১৯৬১? তা হবে। যখন কফি বোর্ড কফি হাউসটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ভাবা গিয়েছিল, ইউনিভারসিটি পাড়ার এই তীর্থস্থানটা লুপ্ত হয়ে গেল বুঝি। তারপর অনেকদিন পর খুলল আবার। সব ঠিকঠাক আছে। কর্মচারীরা ওটাকে ভাগাভাগি করে নাকি কিনে নিয়েছে। ওদের মতো নিয়মিত খদ্দেররাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব নানান কথা ভাবছে, এমন সময় চোখ পড়ল, দূরে হাত তুলে ডাকছে ওকে, অভ্র। ও তবে আগে থেকেই এসে বসে আছে। ভিড় কাটিয়ে রণেন অভ্রর সামনের চেয়ারটায় বসে।

—অনেকক্ষণ এসেছিস? রণেন জিগ্যেস করে।

—অন্তত আধ ঘণ্টা। এখন ক'টা বাজে জানিস? এগারোটা। কখন তোর আসার কথা ছিল?

—একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। কিচ্ছু বদলায় নি রে। সব আগেকার মতন আছে।

—না। চারদিকে চেয়ে দেখ—ছেলেগুলো যারা বসে আছে, একজনও আমাদের চেনে না। এরা নেক্সট্ জেনারেশন, আমাদের হটিয়ে দিয়েছে।

—অথচ, রণেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এক সময় আমরা ঢুকলে চারপাশ থেকে হাত তুলে সবাই ডাকত। তোকেই বেশী। তুই ফ্রি কফি আর সিগারেট খাওয়াতিস যে।

—শুধু তাই নয়।

—তা ছাড়া তোর একটা আলাদা গ্ল্যামার ছিল তখন। মনে পড়ে? প্রায়ই একজন না একজন বান্ধবীকে নিয়ে ঢুকতিস। কফি হাউসে বান্ধবীর সঙ্গে এলে তার খাতিরই ছিল আলাদা। সবাই ঈর্ষায়, কৌতুকে চেয়ে থাকত, না রে?

—সেই গ্ল্যামার খেয়েই তো ফেঁসে গেলাম শালা। অনেকদিন পর অভ্রর মুখে গালাগালটা শুনে রণেনের মিষ্টি লাগল।—ফেঁসে গেলাম। উজ্জয়িনীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওকে বিয়ে করে ফেললাম।

—তাই তো স্বাভাবিক রে। আমরা সবাই তাই করেছি। কফি হাউসের সঙ্গে তো কারোও বিয়ে হবার উপায় নেই।

—তা নয় রে! তুই আবার জ্ঞান দিচ্ছিস কেন? উজ্জয়িনীরা ভালবাসি-ভালবাসি মুখ করে আসে। অন্য সব বন্ধুদের টেক্কা দিয়ে আমি জিতে গেলাম এই ভেবেই না বিয়েটা করেছিলাম। তোরা বোধ হয় হেসেছিলি তখন, না রে?

—না। মোটেই না। আমরা খুব ডিস্অ্যাপয়েনটেড হয়েছিলাম। প্রথমত, তুই একা পেয়ে গেলি, আমরা পেলাম না। তা ছাড়া, তোকে হারালাম। রণেন একটু চুপ করে থেকে বলল, তারপর অবশ্য আমরা সবাই একে একে—

—ফেঁসে গেলি? জায়গা করে দিলি এদের। অভ্র জিগ্যেস করে, কফি খাবি তো?

এতক্ষণ পরে ওদের কফি খাওয়ার কথা মনে পড়ল। অভ্র টেবিলে পয়সা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকল। একটা কফি ও খেয়েছিল আগেই, আবার দুটোর অর্ডার দিল। জিগ্যেস করল, খাবার কী পাওয়া যায় আজকাল?

—পকোড়া, চিপস্, অমলেট, দোসা—বেয়ারাটা বলল।

—দোসাটা নতুন আইটেম মনে হচ্ছে, অভ্র মজা পায়—দাও, দুটো দোসাই দাও।

খেতে খেতে অভ্র বলল, তোর সঙ্গে একটা দরকারি পরামর্শ আছে। এখানে সুবিধে হবে না।

—কী হল আবার? চাকরি সংক্রান্ত? রণেন অবাক হয়। অভ্র সাধারণত কারও পরামর্শ চায় না।

না রে না। বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বলব, বলব। চল্, এখান থেকে উঠে অন্য কোথাও বসি।

কফি ও দোসা শেষ করে দাম চুকিয়ে ওরা উঠে পড়ল। যাবার সময় একবার

চোখ বুলিয়ে নিল রণেন, চেনা কেউ আছে কিনা। কেউ নেই। শুধু সেই লম্বা, রোগা ভদ্রলোকটি, যাকে ও ঠিক চিনত না, কিন্তু দেখত সে-সময় অল্পবয়সীদের সঙ্গে আড্ডা মারতে। আজও তাই; নেক্সট্ জেনারেশনের সঙ্গে ওই ভদ্র-লোকের ভাব হয়েছে। জেনারেশনের পর জেনারেশনকে ওই ভদ্রলোক কম্পানি দিয়ে যাচ্ছেন। আবার রণেন উল্টো করে কথাটা ভাবল। আসলে, লোকটির মধ্যে হয়তো জটিলতা নেই, ভণ্ডামি নেই, তাই উনি পারেন মিশে যেতে। ভদ্রলোকের মন নিশ্চিত সরল, সেই মন যা দেখে তাই উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। আমরাই জটিল হয়েছি, বিচ্ছিন্ন হয়েছি।

ওয়াই এম সি এ-র দিকে যেতে-যেতে দেখে, ওভারটুন হলটা কাপড়ের দোকান হয়ে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার! তা হলে রেস্তোরাঁটাও কি আপিস-টাপিস হয়ে গেল নাকি? দেখা যাক না, এই ভেবে ওরা ভেতরের দিকে এগোল।

বাঁ দিকের পেচ্ছাবখানাটায় এখনো তেমনি দুর্গন্ধ। পর্দা-ঘেরা সেই কেবিন-গুলো আছে। আগে যেমন থাকত। ছেলেমেয়েদের প্রেম করার জন্যে। চুমো-টুমো খাওয়া চলে ওর মধ্যে, খুব নিঃশব্দে। কিংবা হাতে হাত রাখা, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেওয়া মেয়েদের—এই অবধি। অবশ্য একটা বয়সে সেই সুযোগও বা কোথায় পাওয়া যেত! কলকাতা শহরে, কম খরচে, নির্জনে প্রেম করার মতো কোনও জায়গা তখন ছিল না, এখনও নেই।

চায়ের অর্ডার দিয়ে অভ্র রণেনকে জ্যেঠামশায় সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলল। সেই গ্রে স্ট্রীট পাড়া থেকে তাঁর মৃতদেহ তুলে আনা থেকে শুরু করে ওর বাড়িতে বীণাপাণির হাজির হওয়া পর্যন্ত।

—এখন কী করা যায়, বল তো? অভ্র রণেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

প্রথমটা কিছু বলে না রণেন। লোকটাকে তেমন পছন্দ ও কোনওদিন করত না যদিও, তবু মানুষটা সম্পর্কে ধারণা ওর খুব নিচু ছিল না। সব বুড়ো মানুষরা যেমন, উনিও তেমনি। একটু পরে বলল, তোকে বেশ প্যাঁচে ফেলে গেছে জ্যাঠামশাইটা, তাই না?

—ব্যাটা মহা শয়তান। মুখ দেখে একদিনও বোঝা যায় নি, বুড়ো বগলে কেপ্‌ট্ নিয়ে ঘুরছে।

রণেন অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়, রসিক লোক।

অভ্র জিগ্যেস করে, তা বলে আমি তো ভিখিরি হয়ে যেতে পারব না। লড়ে যাই, কী বলো?

—সার্টেনলি। টেবিলে থাপ্পড় মেরে রণেন উত্তর দেয়, একটা বেশ্যাকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বসবি নাকি?

থাপ্পড়ের শব্দ শুনে একজন বেয়ারা পর্দা ফাঁক করে দাঁড়ায়। কী চাই! অভ্র এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিল। সিগারেট এলে, নিজেরটা ধরাল,

রণেনেরটাও।

তারপর বন্ধুকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে—কিন্তু বেশ্যা প্রমাণ করব কী করে বল্? ওর যে সার্টিফিকেট রয়েছে। রেজিস্ট্রী করা উইল রয়েছে। আমি যাচাই করেছি। শেষকালে বানের জল বার করতে গিয়ে ঘরের জলটাও বেরিয়ে যাবে। একটু থেমে ও বলল, তা ছাড়া—

—তা ছাড়া?

শান্তভাবে ওকে বাড়িতে থাকতে দিলে, ভাবছি, ক্ষতি কী। পরে আর ঝামেলা থাকবে না। না দিলে ও-রাস্তাটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ভাবছি—

—একটা কমপ্রোমাইজ করবি?

—আর কিছু না! রণেনকে নিজের দিকে আনতে চাইল অভ্র। বলল, এখন বয়েস-টয়েস হয়ে গেছে ওর। ক্ষতি করার সামর্থ্য তো নেই। এবং বেশ অসহায় অবস্থা, হাবভাব দেখে মনে হল, আশ্রয় চাইছে। তবে—

—তবে কী!

অভ্র দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলে, বাড়ির মধ্যে ওই রকম একজন মেয়ে জ্যেঠাইমা হয়ে ঘুরবে-ফিরবে, শোবে, ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে। এডজাস্ট করা মুশকিল, বুঝলি না!

—অভ্র! রণেন এবার একটু চেঁচিয়েই বলল, তোর মুখে এসব কথা মানায় না। নিজের বুকের ওপর বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে রণেন বলল, চিরকাল আমিই বরং একটু পুরনোপন্থী। তুই তো সেদিক থেকে ঢের সংস্কারমুক্ত ছিলি। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাইতিস।

অভ্র তেমনি শান্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল, তাই। এই সব সিচুয়েশন আসলে আমাদের এক ধরনের পরীক্ষা। যা মুখে বলছি বিশ্বাস করি, সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করি কি না। তবে, এর একটা প্র্যাকটিক্যাল দিকও আছে।

—তোর সমস্যাটা থ্রি-ডাইমেনশনাল! রণেন এবার ঠাট্টা করে।

অভ্র ওর কথায় কান না দিয়ে বলে চলে, ভাবছি, কিছুদিন পরে জয়ীর ছেলেপুলে হবে, তখন দেখাশোনা করার জন্যে একজন লোক তো দরকার।

—বাচ্চা হবে? রণেন আকাশ থেকে পড়ে। আবার সামলে নেয়, দারুণ সুখবর, এতক্ষণ তো বলিস নি—

অভ্র এইবার খোঁচা দেবার সুযোগ পেয়েছে। সুযোগটা ছাড়ল না। জিগ্যেস করল, তোর উৎসাহিত হবার কী আছে এত? পিকনিকের ঘটনা এক বছরের বেশী পুরনো। সুতরাং বাচ্চাটা আমারই। তুই লাফিয়ে উঠছিস কেন?

—এবার তোকে একটা ঘুঁষি লাগাবো নাকে, নাক ফাটিয়ে দেব।

আসলে রণেন প্যাঁচে পড়ে গেছে অসাবধানে। তাই রেগে উঠছে হঠাৎ—যত আজেবাজে কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না?

এক মুহূর্তের জন্যে উজ্জয়িনীর শরীরটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল দূরে।

—আচ্ছা বাবা, আর বলব না। মাপ কর। তোকে একটু টীস্ করলাম। অভ্র ঠাট্টা করে রণেনের গায়ে হাত রেখে বলে, সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওসব ভুলে গেছি। অভ্র ওর মনটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল, তবে তোর বউ সেই থেকে কেমন স্টিফ হয়ে আছে আমাদের ওপর। কেন, বল তো?

—বাজে কথা বাদ দে। বাদ না দিয়ে নিজেই ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল, হয়তো কিছু আছে খানিকটা। ওর মতো মেয়ে, যেভাবে মানুষ হয়েছে, যে সব বিশ্বাস-টিশ্বাস ও এখনো পুষে রাখে, তাতে অন্য পুরুষের সংসর্গকে খোলা মনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভবই না। ও একেবারে সেকেলে। এত বক্তৃতা ঝেড়েও তুই ওকে মানুষ করতে পারলি না।

বলতে বলতে জয়ীর মুখটা মনে পড়ল আবার। গোলগাল, ফরসা মুখ। ওর বাচ্চা হবে। মুছে দিল ছবিটা চটপট, বলল, লুকিয়ে-চুরিয়ে ব্যভিচার হলে হয়তো একটু আড়াল থাকত, এ একেবারে ওপ্‌ন। তাই টাল খেয়ে গেছে আর কী।

—আমাদের ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, না রে?

—কিছু না, কিছু না। রণেন স্মার্ট হবার চেষ্টা করল, জীবনকে অত সরলভাবে নেওয়ার কোন মানে হয় না। চল্ না, আর একবার আমরা পিকনিকে বেরোই। সেই রকম। যাবি?

—পেটে বাচ্চা নিয়ে সুবিধে হবে? বলে হো হো করে হেসে উঠল অভ্র। রণেন এবার বেশ লজ্জা পেয়েছে। রাগতেও পারল না বেসামাল হয়ে। ভেতরে ভেতরে সোমাকে অভ্রর হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে জয়ীকে পাবার ইচ্ছেটা যে বেশী কাজ করছিল, তা যেন ধরা পড়ে গেছে।

—আমরা কী রকম হয়ে গেছি, না রে? এক চুমুকে বাকি চা-টা শেষ করে অভ্র প্রসঙ্গ বদলায়। বিশ্বাস করতাম, একজন সক্ষম পুরুষের সঙ্গে একজন সক্ষম রমণীর সহবাস সবচেয়ে স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যসম্মত। তারা বিবাহিত কি বিবাহিত নয় এ প্রশ্ন অবান্তর, মনগড়া। প্রোফেস করতাম, আমাদের স্বার্থ-প্রণোদিত নিয়ম ভিত্তিহীন। আর এখন দেখ, এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কত কনসার্নড্ আমরা, কত চিন্তিত।

রণেন জবাব দিল না। নিজের মনেই বিশ্বাসের অর্ধবৃত্তাকার ছবিটা আঁকার চেষ্টা করল। বেয়ারাকে ডেকে পয়সা মিটিয়ে দিল রণেন।

বেয়ারা চলে যেতে অভ্র আবার শুরু করে, এক এক সময় আমার মনে হয়, এই মেয়েগুলো আমাদের বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে, না রে? মনে হয়, আমাদের, ছেলেদের, বন্ধুত্বের প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে মেয়েরা। আমাদের স্ত্রীরা।

পাইথনের মতো ওরা আমাদের হাত-পা-বুক-পেট-গলা পর্যন্ত গিলে রাখতে চায়। সবটা গেলে না, যাতে মরে না যাই। আমাদের মুণ্ডুটা বাঁচলে ওদের সিঁথিটা বাঁচে।

—ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান—রণেন ফোড়ন কাটে।

—অথচ একাধিক মেয়ের সঙ্গ পাওয়ার অধিকার, সুযোগ, পুরুষের থাকা দরকার। ভালবাসার সঙ্গে যৌনতাকে গুলিয়ে ফেললে সব গোলমাল হয়ে যাবে। এই সোজা জিনিসটা অভ্র রণেনের মারফত সোমাকেই বলতে চাইল যেন।

—বার্ট্রান্ড রাসেল! রণেন কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। অরিজিন্যাল কিছু ছাড়!

—ঠিক আছে শালা, প্যাঁচে পড়েছি, তাই আজ তুই একহাত নিয়ে গেলি। অভ্রও উঠে পড়ে। ওরা পর্দা সরিয়ে বেরোয়। বেশ বেলা হয়েছে। গোল ঘড়িটায় দুটো বাজে। তার মানে আড়াইটে? নাকি ঘড়িটা এখন সারিয়েছে এরা?

## ১২

আমি সোমা। সোমা দত্ত। আমি রণেনের স্ত্রী, মৌরীর মা, দত্ত পরিবারের বউ। এই গল্পে আমার চরিত্র একটু নির্জীব, নিস্পৃহ। কারণ, বেশী কথা-বার্তা আমি বলতে পারি না, বা শুনতেও পছন্দ করি না। আমি আড়ালে অন্তরালে চুপচাপ থাকতে ভালবাসি।

বেশ কিছুদিন ধরে কতকগুলো চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ভিড় করে আছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে চিন্তাগুলো। স্থির হয়ে বসে বিশ্লেষণ করা দরকার। ঝাপসাভাবে আমার মনে হচ্ছে, সব ঠিকঠাক নেই। যে-রকমভাবে এই সংসারটা, আমার জীবন চলা উচিত, সে রকম চলছে না। অথচ গোলমালটা কোথায়, আমি ঠিক ধরতে পারছি না। এও হতে পারে, গোলমালটা এই সময়ের, যুগের। ছন্নছাড়া এই এখনকার সময়, ছন্নছাড়া এই কলকাতার মানুষগুলো। রণেন এই সময়ের ভিক্‌টিম। রণেনের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে হালকা হতাম।

একদিন কথাটা পেড়েছিলাম। ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, অনু স্বামীকে ছেড়ে চলে এসে ভাল করেছে, ঠিক করেছে?

ও বলল, না করে কী করত? আত্মহত্যা?

—মানুষ সহ্য করে, অপেক্ষা করে। মানুষ পরিবেশ বদলাবার চেষ্টা করে, দুঃসময়কে অব্যর্থ বলে মেনে নেয় না।

—হয়তো ওর সে ধৈর্য নেই। হয়তো বুঝেছে, ও-বাড়ির পরিবেশ বদলাবে না।

—আর ও নিজেকেও বদলাবে না। মানুষ অ্যাডজাস্ট তো করে। তুমি-আমি কি করি নি? করি না?

চিত হয়ে শুয়ে সীলিং-এর দিকে চোখ রেখে রণেন বলেছিল, আমাদের চরিত্রের কোণগুলো অত প্রখর নয়। অনেক দিক থেকে আমরা সাধারণ মানুষ, অত্যন্ত মামুলী চরিত্রের লোক। বোকাসোকা বলে ও একটু আলাদা।

আমি উঠে বসলাম বিছানায়। ঘরটা অন্ধকার, কিন্তু বাইরের রাস্তার আলো এসে একটা আবছায়া সৃষ্টি করেছে। বললাম, তুমি ব্যাপারটা খুব সরল করে দেখছ। আমি রণেনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম সেদিন। বলেছিলাম, বেশ তো, ওর কি বোঝা উচিত ছিল না, নিজের সংসার ছেড়ে যেখানে আসছে সে জায়গাটাই বা ওর পক্ষে স্বস্তিকর হবে কিনা। বাপের বাড়িতে—তাই বা কেন—ভাইয়ের বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে কেউ থাকতে চায়? যেখানে মর্যাদা নেই, অধিকার

নেই, সেখানে বাস করা তা ছাড়া আবার কী?

রণেন এবার এ-পাশে ফিরল। ইন্টারেস্ট পেয়েছে। জিগ্যেস করল, তোমার সঙ্গে অনুর কোনও কথা হয়েছে?

আমি বললাম, প্রথম দিকে ও কিছুই বলে নি আমায়। মাকে কী বলেছে না বলেছে, আমি জানি না। তবে সেদিন, সুবীর চলে যাবার পর, ও এসে জিগ্যেস করল, আচ্ছা বৌদি, কী করি বল তো?

—কী বললে তুমি? রণেন আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়।

—বললাম, তুমি যা ভালো আর উচিত বোঝ তাই করবে। জীবনটা তোমার। পরামর্শ করতে হলে এ ব্যাপারে, আমার সঙ্গে না, মায়ের সঙ্গেও না, তোমার দাদার সঙ্গে করা উচিত। অনেক ব্যাপারে, জানো অনু, বিশেষ করে বিপদে পড়লে, আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি একদম কাজ করে না।

—না, দাদাকে আমি জিগ্যেস করব না। ও স্পষ্ট জানিয়ে দিল আমায়।—দাদা যা বলবে তা আমি জানি। বলল, তা ছাড়া এই তিন-চার মাস এসেছি, দাদা তো কোনওদিন জানতে চায় নি, আমার কষ্টটা কী, কেন চলে এলাম!

আমি তখন বললাম, মায়ের কাছে সব শুনেছে ও, তাই আলাদা করে জিগ্যেস করে নি তোমাকে। করেই বা কী হবে? সমাধান তো নেই ওর হাতে।

ও তখন বলল কী জান? বলল, তুমি জান না বৌদি, দাদা এরকম ছিল না। দাদা বদলে গেছে।

রণেনকে বললাম, ও ঠিকই বলেছে। অনুর সঙ্গে তোমার একদিন খোলা-খুলি কথা বলা উচিত ছিল। কী করা ওর উচিত বা উচিত না, তাই নিয়ে। ওর সম্বন্ধে তোমার মনে কোনও মমতা বা সহানুভূতি আছে কি নেই, তোমার ব্যবহার থেকে তা জানা যায় নি।

শুনে রণেন অমনি বলে উঠল, আমার এ-সব মেয়েলি সমস্যার মধ্যে মাথা গলাবার প্রবৃত্তি হয় না। ব্যস।

আসলে ও হল ওইরকম। সব কিছু করবে, মেনে নেবে, আপত্তি করবে না। দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করবে না। সাধ্যের বাইরেও দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেবে। কিন্তু প্রসন্ন মনে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বইতে পারবে, বোঝা বাড়িয়েই যাবে, কথা বলবে না। গুমরোবে ভেতরে-ভেতরে। তারপর এক সময় ফেটে পড়বে। তখন হাত-পা ছেড়ে দেবে একদম। সব তছনছ। যেমন মৌরী হবার সময় হয়েছিল একবার। এখন অবশ্য ভাবতে মজা লাগছে, তখন লাগে নি।

সেবার মৌরী হবার সময়, পাঁচ মাস হতে না হতেই আমার নানান রকম অসুখ দেখা দিতে লাগল। পা ফোলে, শরীরে রক্ত নেই, কিছু খেতে পারি না। ভাল লাগে না কিছু। খিটখিটে হয়ে পড়ি অল্পে। তখন ও কী না করেছে! ডাক্তার-ওষুধ তো করেছেই, তা ছাড়া আমায় নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে

বেরিয়েছে। ডাক্তার বলেছিল, রোজ আমার খানিকটা করে হাঁটা উচিত। আপিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরত, তারপর জলটল খেয়ে আবার আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। ও তো আনন্দের বেড়ানো নয়, কর্তব্যের। অথচ মুখে কোনও বিকার নেই। আপিস থেকে ফেরার পথে কোথায় বৌবাজার, শেয়ালদা, কোথায় হাতি-বাগান—সেখান থেকে আমার পথ্য, মুখরোচক খাবার জিনিস কিনে নিয়ে আসত খুঁজে-খুঁজে। আমার মন ভাল রাখার চেষ্টা করত নানান গল্প বলে। যেন ছেলেমানুষের সঙ্গে কথা বলছে। আমি বুঝতাম। তবু ভালো লাগত। আমার শরীরের যে এত ভার, সে তো ওর জন্যেই। একটু-আধটু যত্ন তো ও করবেই।

হঠাৎ একদিন কী একটা ব্যাপারে খিটিমিটি হয়েছে। আর ও অমনি বলে বসল, আমার পক্ষে আর সম্ভব না। মরে যাব নাকি? অর্থাৎ, হঠাৎ ওর—কী বলব—ইণ্টারেস্ট চলে গেল। এর পর পনের দিনের ছুটি নিয়ে পুরী না কোথায় বেড়িয়ে এল বন্ধুদের সঙ্গে। সেই পনের দিন যে কী ভাবে কেটেছে, আমিই জানি। মা হাল ধরেছিলেন খানিকটা। কিন্তু ভগবানের দয়ায় অন্য কোনও উপসর্গ জোটে নি ভাগ্যিস। প্রথমবার বাচ্চা হবার সময় কী না হতে পারত। তখন মা কি একা সামলাতে পারতেন? পারতেন না। আমি হয়তো মরেই যেতাম।

এক এক সময় ও এইরকম অবিবেচকের মতো কাজ করে। এখন, এই সময়, আমার সেই রকম ভয় করছে। ওর পক্ষে বোঝাটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার একদিন কিছু একটা করে বসবে। কার ওপর সে খাঁড়া গিয়ে পড়বে জানি না। আমি সে অবস্থাটা এড়াতে চাই। যাক্, যা বলছিলাম—

অনু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বলল, চলেই যাই, কী বলো, মানুষটা ডাকতে এসেছিল। ওর শরীর আবার ভাল থাকছে না, বলল। থাকবে কোত্থেকে? এত অত্যাচার করলে, মানুষেরই তো শরীর! আমি রাগ করে বসে থাকলে ও হয়তো চাকরিবাকরি ছেড়ে একটা কাণ্ড বাধাবে ঠিক। কী খামখেয়ালি ও, তুমি জান না বৌদি।

সুযোগ পেয়ে আমি বললাম, কিছু মনে কর না অনু, আমার মতামত যদি শোন, তবে বলব, হুট করে তোমার চলে আসাই উচিত হয় নি। অন্যভাবে নিও না কথাটা। দেখ, নিজের জায়গা, নিজের সংসার। নিজের অধিকার ছেড়ে আসবে কেন? ছেড়ে দিলেই তো ছাড়া হয়ে যায়। ছেড়ে দিলেই জায়গাটা ভরাট হতে থাকে। থেকে বরং জঞ্জাল সাফ করা উচিত।

—মানুষটার জন্যে মায়াও হয়, আবার রাগও হয় ওর ওপর। শেষ পর্যন্ত কথাটা অনু বলেই ফেলল।

মানুষটার ওপর মায়াও হয়, রাগও হয়—সব মেয়েদের শেষ কথা। তার

মানে, আমি ওকে ভালবাসি, ওকে ছেড়ে থাকতে ভাল লাগছে না। সেটাই তো স্বাভাবিক। এক সঙ্গে অনেকদিন থাকলে কুকুর বেড়ালের ওপরেই ভালবাসা জন্মে যায়, তো মানুষ! স্বামী-স্ত্রী। দূরে এসে টের পাচ্ছিস সেটা—আমি মনে-মনে বললাম।

একটু চুপ করে থেকে অনু এবার কথাটা ভাঙল। —জান বৌদি, কাউকে বলো না, আমিই ওকে আসতে লিখেছিলাম। অবশ্য লিখি নি যে, তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে বা সেই রকম কিছু। লিখেছিলাম, মা তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন, তা আমি বলেছি, খবরাখবর তো পাই না, কেমন করে জানব। ঘুরিয়ে লিখলাম। ও যে একেবারে ছুটে নিতে আসবে আমায়, কেমন করে জানব। ওকে দেখেই আবার অভিমান এমন গলায় উঠে এল যে, বলে ফেললাম, যাব না। কোনওদিন ফিরব না আমি। আচ্ছা বৌদি, ঠিক করি নি, না! ও যদি আর না আসে?

একেবারে ছেলেমানুষ অনুটা। মনস্থির করতে পারে না। অস্থির প্রকৃতির। বোকাও বটে। তাই ও বার বার ভুল করে। আমি বললাম, সে কথা ভেব না, ওকে না হয় একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো যাবে। একটা উপলক্ষ করে। এই তো কয়েক দিন পরেই মৌরীর জন্মদিন আসছে, সেই দিনই ওকে ডাকা যাবে না-হয়!

অনুর জন্যে একটা ব্যবস্থা না হয় আমি করে দেব। কিন্তু, আমার জন্যে কে করে! আমি যে বাড়ির মধ্যে থেকেও নেই। আমার যে কোথাও যাবার জায়গাও নেই। দিনের পর দিন ঘরেতে পরবাসী হয়ে থাকা—আমার ভাল লাগে না।

রণেনকে কিন্তু আমি ভালবাসি। হ্যাঁ বাসি। নির্ভর করি আন্তরিকভাবে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, যাই বল, আমার চোখের সামনে একটাই, সে ও। কিন্তু ও কেন একটা ব্যবধান রেখেই দিল আমি জানি না। যে রকম ঘনিষ্ঠতা হলে পরস্পর মিশে যাওয়া যায়, তা হল না ওর সঙ্গে। ওর মধ্যে আবেগ বড়ো কম। কর্তব্যবুদ্ধি ওর ভালবাসার চেয়ে ঢের বেশী সজাগ। জানি না, ভাবপ্রবণতাকে ও ছেলেমানুষী মনে করে কিনা। বছরের পর বছর ধরে ওর ঘর করছি, কিন্তু কোনওদিন ওকে আমার জন্যে বেসামাল, আত্মহারা হতে দেখলাম না। যাকে ভালবাসি, তার জন্যে কী না করা যায়! কিন্তু একবারও দেখলাম না ওর কাঁধের-ওপর-উড়তে-থাকা হলুদ উত্তরীয়। স্বপ্নে আমি ভালবাসার এই রকম চেহারা দেখতাম এক সময়ে, ছোটবেলায়। কেন ও এত ঠাণ্ডা, সেইটেই আমার ক্ষোভ, আমার দুঃখ। ও আমাকেও ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।

সেই তুলনায় অভ্র বেশ সরগরম, ছটফটে। ছেলেমানুষ প্রকৃতির। কেন অভ্রর কথা মনে হল হঠাৎ? না, ওকে আমি মনের কোণেও জায়গা দিই নি।

তবু, এক এক সময়ে যে মনে হয়, আমার ভেতরে দুঃখের যে ফাঁকগুলো আছে, অপ্রাপ্তির শূন্য জায়গাগুলো আছে, তা যেন অভ্রর মতো কেউ ভরিয়ে দিতে পারত! হয়তো উজ্জয়িনীরও রণেনকে নিয়ে তাই মনে হয়। হয়তো রণেনেরও আমাকে নিয়ে তাই মনে হয়—ইনকমপ্লিট, অসম্পূর্ণ। ওর জয়ীর সম্পর্কে অভ্রও কি তাই ভাবে? আশ্চর্য, আমরা কেউ একজন একজনের পক্ষে যথেষ্ট নই। আমার যে প্রিয়জন, তার মধ্যেকার কতকটা অংশ পছন্দ করি না। নানান মানুষ থেকে টুকরো-টুকরো নিয়ে একটা অন্য অবাস্তব মানুষ তৈরি করে আমরা তাকে পাবার স্বপ্ন দেখি। তাই এত দুঃখ পাই। তাই আমাদের দুঃখের শেষ নেই।

দুঃখ পাই যতই, আমি জীবনকে তত বেশি করে ভালবাসি। একদিনও আমার মরতে ইচ্ছে করে না। চিরকাল কারও খারাপ কাটে না। ভাল উজ্জ্বল সময় নিশ্চয় একদিন আসবে, গ্লানি ধুয়ে যাবে, মালিন্য থাকবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব। মৌরীকে বড় করব। লেখাপড়া শেখাব। নাচ শেখাব, গান শেখাব : ওকে ভালবাসতে শেখাব। যা আমি পরি নি, আমরা পারি নি, ও তাই পারবে। আমরা দুজনে মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারব। হ্যাঁ, আমরা দুজন, একত্র। রণেন আর আমি। মাঝখানে কেউ থাকবে না।

রণেনকে তো দেখছি, ওর বোন অনুকে, সুবীরকে—আবার অভ্র-উজ্জয়িনীকে —কেউই এরা সেই অর্থে দোষী নয়। আবার এই যে ভাবলাম, আমরা অন্য একজন মানুষ, অবাস্তব চরিত্র রচনা করে, মনে-মনে তাকে প্রেম নিবেদন করি--যদিও তার সঙ্গে আমাদের নিকটজনের মিল নেই চরিত্রের—তাও হয়তো ঠিক নয়। হয়তো আমাদের ভেতরে ভালবাসারই অভাব। ভালবাসতে পারারই অক্ষমতা। প্রেম থাকলে তা তো পাথরের মূর্তিকেও ঢেলে দেওয়া যায়—যেমন দিয়েছিলেন মীরাবাঈ। যে-মানুষকে কোনওদিন কাছে পাওয়া যাবে না, তাকেও পুজো করা যায় ভালবাসা দিয়ে—যেমন সুজাতা করেছিলেন অস্থিচর্মসার ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থকে। সারনাথের বুদ্ধমন্দিরে সেই আত্মনিবেদনের ছবি আমি দেখেছি। তাই মনে হয়, প্রেম বা প্রেমবোধ নেই আমাদের, এইটেই সত্যি। বড় কঠিন সত্যি। কিন্তু কেন? কোথায় গেল? না কি কখনোই জন্মায় নি? কেন আমরা প্রতিদান না চেয়ে, প্রত্যাশা না করে, সব দিয়ে দিতে পারি না? কেন আমরা এত আত্মমুখী হয়েছি, স্বার্থপর হয়েছি জীবনে? এভাবে কি কিছু পাওয়া যায়? কড়া-গন্ডা হিসেব করে দাবী জানালে মজুরী হয়তো বাড়ানো যায়, অমৃতলাভ করা যায় না। ভালবাসাকে অমৃতর সঙ্গে তুলনা করা কি বোকামি হল?

ভয় করে ভাবতে, এভাবে চললে একদিন সব ভেঙে যাবে, ধসে যাবে। যা ভাঙা উচিত আর যা ভাঙা উচিত নয়—সব। কী ভীষণ দুঃসময়ে আমরা

জন্মালাম। কী ভীষণ দুর্দিন, শুকনো খরার দিন, আমাদের সামনে। ভাবতে গেলে ভয়ে হিম হয়ে যাই। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায় বার বার। যখন কষ্ট পেয়েছি ঢের, কিন্তু ভয় পাই নি।

বাবাকে মনে পড়ে। বাবা বাড়ি থেকে চলে গেল। তখন আমার দশ বছর বয়েস। কেন গেল কেউ জানে না। কোথায় গেল, বলে গেল না। বাবাও কি ভালবাসতে পারে নি মাকে, আমাকে? নাকি আবার সেই ভীষণ শুকনো অভাব সহ্যও করতে পারে নি। তাই চলে গেল, পালিয়ে গেল।

আমরা পালাই না। হয়তো পালাতেও ভয় পাই। আমরা এখন সহ্য করতে শিখেছি। রণেন বলে, আমরা তারের ওপর হাঁটছি। পাশের বাড়ির পাগল ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে, ও তার থেকে পড়ে গেছে। রণেনের রসিকতা বড়ো অন্তর্ভেদী।

এখন মনে হচ্ছে, সেই বুড়ো লোকটা, যার সঙ্গে আমার বার বার দেখা হয়ে গেছে, যে সেদিন খেলনার দোকানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মৌরীকে তার মামার বাড়ির কথা জিগ্যেস করল, এবং জেনেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে, সে যদি...? না, না, তা কী করে হবে? তা হলে তো আমি চিনতাম। বাবার মুখ আমি ভুলব কী করে! অসম্ভব। এবং ওর জামা-কাপড় এত নোংরা ছিল, বাবার গায়ে ওই সব পোশাক আমি ভাবতে পারি না। আশ্চর্য, রণেনকে ঘটনাটা বলাই হয় নি। বলি-বলি করেও বলা হয়ে উঠল না। এবার সময়-সুযোগ বুঝে একদিন বলব।

আচ্ছা, ফের যদি লোকটাকে দেখি, আমি কিন্তু এর একটা হেস্তনেস্ত করব। সোজা গিয়ে দাঁড়াব তার মুখোমুখি। জিগ্যেস করব, প্রায়ই আপনাকে দেখি, আপনিও উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকেন। মনে হয় কিছু খুঁজছেন। বলুন আপনার নাম কী? পরিচয় কী?

এখনও আমার মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা। মা বলল, হ্যাঁ রে, তোর বাবা কোথায় বেরিয়েছে, তোকে বলে গেছে?

আমি বললাম, না তো।

মা বলল, না খেয়ে তো কোনওদিন ও কাজে বেরোয় না। আজ সকালে উঠে কোথায় যে বেরোল! পাঞ্জাবিটা ঝোলানো ছিল, এখন দেখছি নেই, ওটাই পরে গেছে।

সারাটা দিন পার হয়ে গেল অপেক্ষায়। মনে একটু সন্দেহ ছিল, হয়তো কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তারপর, দেরি হয়ে যাওয়াতে সোজা চলে গেছে কাজের জায়গায়, সন্ধ্যেবেলা ফিরবে।

মা বলল, ফিরলে বলতে হবে, একটা খবর পর্যন্ত না দিয়ে কী করে বাইরে রইলে সারাদিন? বাড়িতে কেউ যে ভাবছে, ভাবতে পারে, মনে হয় নি একবার?

অদ্ভুত মানুষ তুমি।

কিন্তু সন্ধ্যে পার হয়ে রাত বাড়তে লাগল। মা কান্নাকাটি শুরু করল। আমিও কেঁদেছি দেখাদেখি। কী করব, বুঝতে পারছি না। যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে? তা হলে কী হবে? বাড়িতে আমরা দুজন মেয়ে, কোথায় খুঁজতে বেরোব? বাবাকে ছাড়া আমরা কী অসহায়, সেদিন বুঝলাম।

শেষকালে, পাড়ায় একজনদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল, সেখানে গেলাম আমরা। প্রথমটা ও'রা খুব গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, কোথাও আটকে পড়েছেন নিশ্চয়, ঠিক ফিরে আসবেন, ভাববেন না, এই সব। তাতে তো মন মানে না। দেশ স্বাধীন হবার পর তখন দাঙ্গাটাঙ্গা লেগেই ছিল। মা কান্না-কাটি করতে লাগল খুব। দেখে বোধ হয় ও'দের মায়া হল। থানায় টেলিফোন করলেন, হাসপাতালে খবর নিলেন, শ্মশানে খোঁজ নিলেন। বাবার মতো চেহারার কোনও লোক তারা দেখে নি।

সেদিন রাতটা কীভাবে কেটেছিল আমার একটু একটু মনে আছে। কিছু একটা শব্দ হচ্ছে, মা বলছে, ওই ও এল বোধ হয়। জানালার বাইরে চেয়ে আছে, ওই ওর জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে গলিটার মোড়ে। এইরকম করে আমরা সারাটা রাত জেগে কাটালাম। এক সময়ে মা আমায় খাইয়ে দিয়েছিল, নিজে খায় নি। বাবার খাবার ঢেকে রেখেছিল। মাঝে-মাঝে আমরা চুপচাপ বসে কেঁদেছি। আবার উৎকর্ণ হয়ে পায়ের শব্দ শুনেছি, এই বুঝি বাবা ফিরল!

বেশ রাত হলে পর মা বলেছিল, তুই শুয়ে পড়, আর কতক্ষণ জেগে থাকবি। আমি তো জেগে আছি। বাবা এলে তোকে তুলে দেব। কিন্তু আমার মন যেন এক অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছিল—বাবা বোধ হয় আর ফিরবে না। বাবা চলে গেছে কোথাও।

দু-তিন দিন এইভাবে কাটল। মা পাগলের মতো হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা এসে খোঁজ নিয়ে যায়, সান্ত্বনা দিয়ে যায়। কেউ-কেউ আবার উড়ো খবর দিয়ে যায়—বাবার মতো একজনকে কোথায় দেখেছে, কিন্তু কাছাকাছি যাবার আগে সে লোকটা বাসে উঠে পড়ল। এই রকম। কাজের কাজ কিছু হল না। মা ক্রমশ স্থির হয়ে যেতে লাগল। পাথরের মতন। বোধ হয় বুঝতে পারল, চলেই গেছে, বোধ হয়। কারণও একটা অনুমান করতে পেরেছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু পাথরের মতো স্থির, কঠিন, নিঃশব্দ হয়ে গেল মা। সারা রাত চোখ চেয়ে শুয়ে থাকত, ঘুমত না।

মামাকে চিঠি লিখলাম, কানপুরে। একদিনে আমার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। লিখলাম, আমরা মা-মেয়ে একা কী করে থাকি, আপনি একবার আসুন।

মামা এসে আমাদের সঙ্গে রইলেন কয়েকদিন। নানান জায়গায় নিজেও

ঘোরাঘুরি করলেন ঢের। শেষ পর্যন্ত কোনও সুরাহা যখন হল না, তখন বললেন, এখানে থেকে কী করবি? চল্, বাড়িঘর তালা দিয়ে আমার ওখানে চল্।

বাড়ি ছেড়ে যেতে মায়ের মন সায় দেয় নি প্রথমে। সারা বাড়িতে বাবার জাম-কাপড়, চটি, নস্যির ডিবে ছড়িয়ে আছে। দেয়ালে আমাদের সঙ্গে বাবার ফটো, হাসছে আমার দুটো কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। বাবার শোবার খাট, বসবার প্রিয় চেয়ারটা—সব তো তেমনিই আছে। মাঝখান থেকে মানুষটা উধাও হয়ে গেল। মারা গেলে শেষকৃত্য দিয়ে লোকে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলার সুযোগ পায়, চেষ্টা করে। এ তো তা-ও নয়, একেবারে অন্তর্ধান!

মা বলেছিল, ও যদি এসে ফিরে যায়? যদি চিঠিটিঠি লেখে?

মামা আশ্বাস দিলেন, ফিরলে ঠিক খবর পাব। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। পোস্টাপিসে খবর দিয়ে গেলাম।

সেই যে মামার বাড়ি এসে ঢুকলাম, আর বাড়ি ফিরি নি। কয়েক মাস পর মামা এসে জিনিসপত্র সব নিয়ে গেলেন। বাড়ি ছেড়ে দিলেন। আমি মামার বাড়িতে রয়ে গেলাম। বিয়ে হবার পর সেখান থেকেই সোজা শ্বশুরবাড়িতে এসে ঢুকেছি।...

এই সব ভাবনা ঘাড়ে চাপলে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বুকের ভেতরে হুহু করে ওঠে, চোখের জল পড়ে না। আমারও ভেতরের একদিকটা কেমন শক্ত, নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাই বোধ হয় আমি সহজে আর হাসতে পারি না। অল্পে আনন্দ পাই না আজকাল। চুপচাপ থাকতে চাই, লোকজন বেশী পছন্দ করি না। মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলি। কুঁকড়ে গেছি ভেতরে ভেতরে। তাই বোধ হয়, রণেন আমার সম্পর্কে ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

কিন্তু আমি কী করব? তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না রণেন। কাউকে দিতে পারব না। দুজনে মিলে আমরা মৌরীকে বড়ো করব, মানুষ করব, ওকে ভালবাসতে শেখাব। একা পারব না আমি, তোমাকেও সঙ্গে চাই।

এত সুন্দর জায়গা এই পৃথিবী, এত সুন্দর জিনিস এই জীবন! মানুষ শুধু-শুধুই কষ্ট পায়।

## ১৩

অনু চলে যাবার পর বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। বিশেষ করে, প্রমীলার তো সময় কাটছে না। খুব যে একটা বাড়ি জাঁকিয়ে থাকত তা নয়, তার উল্টোটাই, তবু আর একজনের অস্তিত্ব এই অদ্ভুত চুপচাপ বাড়িটাকে কেমন ভরাট করে রেখেছিল এই ক'টা মাস। ঘুরঘুর করত সারাদিন, এটা-ওটা নিয়ে খেত। মৌরীর সঙ্গে খেলত, ঝগড়া করত। কখনও বা মায়ের সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে বসে গল্পসল্প করত। এমনি তো হয়। মেয়েরা বাপের বাড়ি এসে দু-এক মাস থাকে না? হামেশাই থাকে। ছেলে হতে আসে, ছেলে বড়ো করে নিয়ে যায়। ওর বেলা অবশ্য অন্যরকম ছিল ব্যাপারটা। প্রচ্ছন্ন বিষাদমেশা। চাপা একটা কষ্ট।

কিন্তু কষ্ট নিয়ে তো মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা বাস করে না। তার মধ্যেই হাসে, খেলে, ছবি দেখে, বেড়াতে বেরোয়। মূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো দুঃখকে মনে লুকিয়ে রাখাই তো মানুষের স্বভাব।

মৌরীর জন্মদিনে সুবীরকে ডাকা হয়েছিল। একবার কথা উঠেছিল, অভ্রদেরও বলা হবে কিনা। সোমা নাকচ করে দেয়। অনুষ্ঠানটা পারিবারিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাক।

বেশ তাই হোক, রণেন মেনে নেয়।

একটা প্রকাণ্ড ওয়াকি-টকি নিয়ে হাজির হয়েছিল সুবীর। খুশী-খুশী মুখ। ঠিকঠাক অভ্যর্থনা করা হয়েছিল ওকে। পরিবেশ যতটা স্বাভাবিক রাখা যায়। ভাবটা, যেন কিছুই হয় নি। যেন অনু বাপের বাড়ি এসেছিল। কিছুকাল পরে আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

যাবার সময় কিন্তু অনু সবাইকে হেঁট হয়ে প্রণাম করল। মাকে, দাদাকে, বৌদিকে, জনে-জনে। মৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল।

মৌরী জন্মদিনের নতুন পোশাক পরে কী খুশিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেদিন। খুব ফুর্তি ওর। ও বলল, পিসি, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

—আমরা বাড়ি যাচ্ছি, অনু বলল, তুমি ওখানে এসো একদিন।

—এইটেই তো তোমার বাড়ি। মৌরী কিছুতেই বুঝতে চায় না—আবার কোন্ বাড়িতে যাচ্ছ তুমি?

চোখে জল এসে পড়ে অনুর। অনু কান্না চেপে বলল, আমার যে দুটো বাড়ি আছে। এখানে একটা, আর ওই দিকে আর একটা। সেই যে তুমি গিয়েছিলে, গান শুনেছিলে, মনে নেই? আবার সেখানে এসো। ভাল-ভাল

গান বাজিয়ে শোনাব? হ্যাঁ?

মৌরীকে কোল থেকে নামিয়ে অনু মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল আর-একবার। প্রমীলাও কাঁদছেন। আশ্চর্য, যেন ও প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে বিয়ের পর। যেন, আগে ওর বিয়ে হয় নি! সুবীর কেমন অপরাধীর মতো বসে রয়েছে। এই রকমই হয়; যেতে দিতে ইচ্ছে করে না, আবার দিতেও হয়!

মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অনু বলল, মা চলি। আশীর্বাদ কর, আর যেন ফিরে আসতে না হয়। যেন মন বসিয়ে থাকতে পারি, আশীর্বাদ করো।

শুনে সবাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠেছিল। সোমা পরের বাড়ির মেয়ে, তবু মেয়ে তো! মানুষ তো, চোখে জল না এসে পারে! এমন কি রণেনও—যে নাকি সাধারণত আবেগহীন, চাপা—চোখ মুছছিল।

রণেন বলল, মাঝে-মাঝে আসিস। তোর জন্যে এ-বাড়ির দরজা সব সময়েই খোলা থাকবে। তবে, মনস্থির করে সবায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলিস, তাতেই আসল শান্তি জানবি।

অনু গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। সুবীর চালাবে—সুবীরের পাশে বসল—সামনের সীটে। পাশাপাশি বসলে কেমন মানায় দুজনকে।

কতদিন পরে সকলে এই প্রিয় দৃশ্যটা দেখতে পেল।

মা নেমে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। গাড়ি স্টার্ট দেবে, এমন সময় পাশের বাড়ির পাগলটা চিৎকার করে উঠল, যেন এই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হয়তো সারা সন্ধ্যেটাই গোলমাল করেছে ও; উৎসবের বাড়ি, কেউ কান দিয়ে শোনে নি। এখনই স্পষ্টভাবে শোনা গেল পাগলের উচ্চকণ্ঠ : পাতক, পাতক, এ-বাড়ির অন্ন যে খায় সে গোমাংস খায়।

—আ মরণ! প্রমীলা বাড়ির ভেতরে চলে এলেন।

রণেন, সোমা দুজনেই প্রমীলার মন্তব্য শুনল। পৃথকভাবে দুজনেই ভাবল, সত্যি, লোকটা এত মার খায়, কষ্ট পায়, কিন্তু মরে না! এর চেয়ে কত সহজে, নিরুপদ্রবে কত মূল্যবান জীবন চলে যায়!

তারপর মৌরীকে জামাকাপড় ছাড়ানো, সে এক তুমুল কাণ্ড। কিছুতেই নতুন ঝকঝকে পোশাক ও ছাড়বে না। ওইগুলো পরেই শোবে। প্রকাণ্ড ওয়াকি-টকিটা হাতছাড়া করবে না, ওটা নিয়েই শোবে। অনেক কাকুতি-মিনতি, শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটির পর ও যখন ঘুমোল, তখন রাত অন্তত এগারোটা বেজে গেছে।

* * *

রণেন আপিস থেকে ফেরার সময় সিনেমার টিকিট কিনে এনেছে। ওরা দুজনে দেখবে। মৌরীকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মায়ের কাছে রেখে নিশ্চিন্তে ওরা বেরোবে। নিজেরাও খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেবে। অনেকদিন

পর একটা পরিবর্তনে সোমা খুশী হয়েছে।

এক-এক সময় রণেনের আবার সময়নিষ্ঠা বিষম বেড়ে যায়। যেমন ছবি দেখার বেলায়। আটটা থেকে তাড়া দিচ্ছে, চটপট তৈরী হয়ে নাও। ঠিক সময়ে পৌঁছনো দরকার।

বলে ফেললেই তো কাজ হয়ে যায় না, সোমা মনে-মনে বিরক্ত হয় একটু। রান্নাবান্না সারা করে, সবাইকে খাইয়ে তারপর তো তৈরী হওয়া—সময় একটু লাগবেই।

ন'টায় শো আরম্ভ। আর সোমা যখন সাজগোজ সেরে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল, তখনই প্রায় ন'টা বাজে। অধৈর্য হয়ে রণেন দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছে।

ওকে দেখে রণেন একটু থমকাল যেন। আর-এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল কি? সেদিন জয়ীকে নিয়ে নাইট-শোয় কী একটা ইংরেজি ছবি দেখেছিল। সাজলে-গুজলে সোমাকেও মন্দ দেখায় না। জয়ীকে পাশে দাঁড় করিয়ে ও মনে-মনে দুজনকে তুলনা করতে থাকে। কোন্‌টা ভাল? কোন্‌টা আমার?

মৃদুভাবে বলল, সেজেছ তো খুব, তবে ক'টা বাজল খেয়াল আছে?

—কী করব? দেখলে তো, সব কাজ সেরে—সোমা কাপড় ঠিক করতে-করতে বলে।

—কিন্তু তোমার এত সাজ দেখবে কে? 'হল' তো অন্ধকার যখন আমরা পৌঁছব, আর যখন বেরোব, তখন লোকেরা বাড়ি ফেরার জন্যে ছুটোছুটি করছে। কে দেখবে তোমাকে?

—তুমি দেখবে। তা হলেই হল। সোমা ঠোঁট টিপে হাসল।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রণেন এই কথার জবাব দেয়, সুন্দর জামাকাপড় পরে সাজলে তোমাকে বেশ সুন্দর দেখায় কিন্তু। তবে—

—তবে কী? সোমা গলিটা পার হয়ে ওর হাত ধরে।

—তবে, রণেন একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, একেবারে কিছু না পরলে যেমন, তেমনটা নয়।

—অসভ্যতা কর না। কে কখন শুনবে—

—অনেকদিন পর অসভ্যতা করার সুযোগ হল সেটা দেখছ না! রণেন ওর হাতে চাপ দিল একটু। তোমাকে যেন অপরিচিত লাগছে। ইচ্ছে করছে, তোমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই, ইলোপ করি।

রাস্তায় লোকজন এখন বেশ জমজমাট। দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। বেশ কয়েকটা দোকান এখনও খোলা। ঝকঝক করছে রাস্তা। সন্ধ্যেবেলা, বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল একটু, ধুয়ে দিয়েছে সব। ট্রাম-রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরবে ওরা।

পথে একটা প্রকান্ড শাদা বাড়ি পড়ে। পাড়ার মধ্যে এই বাড়িটার সামনেই বাগান আছে একটা। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ওরা জলে-ভেজা ফুলের মিষ্টি গন্ধ পেল।

—বল তো কী ফুল? সোমা রণেনের হাতে টান দিয়ে জিগ্যেস করল। রণেনের মন কিন্তু এদিক-ওদিক খালি ট্যাক্সির দিকে। অন্যমনস্কভাবে বলল, বড়ো কড়া গন্ধ, চাঁপা হবে।

—চাঁপার গন্ধ এইরকম হয়? সোমা শ্বাস টেনে পরীক্ষা করে। এ নিশ্চয় কদম। আমি বেট ফেলে বলতে পারি।

—বেশ বাবা, কদম। এখন একটু পা চালিয়ে হাঁটো।

—আমায় এনে দেবে কদম ফুল একটা? সোমা আবদারের সুরে বলে, খোঁপায় পরব। হলুদ শাড়িটার সঙ্গে যা মানাবে না!

—এই আবার নতুন ঝামেলায় ফেললে। এখন কোথায় পাব কদম ফুল!

—কেন, এই বাড়িটাতেই—

—খোঁপায় কেউ কদমফুল গোঁজে? আমি তো জীবনে দেখি নি।

—হ্যাঁ, গোঁজে। তুমি জান না।

—তোমার আবদার তো কম না। রণেন রেগে ওঠে এবার। এখন আমি গেট দিয়ে ঢুকে দারোয়ানকে গিয়ে বলব, একঠো কদম ফুল তোড় দেও, মেরা আওরৎ খোঁপা মে লগায়েঙ্গী—

—হ্যাঁ, তাই বলো। হিন্দীটা অবশ্য অসহ্য। সোমা জিদ ছাড়ে না, না পারো আমি গিয়ে বলছি।

অগত্যা ঢুকল রণেন। খুব দ্বিধাগ্রস্ত; জানে, কদমফুল পাড়া তো মুখের কথা না। এ তো বেল-জুঁই চারা নয় যে, পটপট করে তুলে দেবে। এর জন্য গাছে চড়তে হবে। এত রাত্রে গাছে চড়তে বলা যায় কাউকে! শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, দু-চার আনা কবুল করবে আগে থেকেই।

এত সব কিছুই করতে হল না। ঢুকেই দেখে, মালী গোছের একজন আট-দশটা ফুল নিয়ে বাগান পার হয়ে ভেতরের দিকে যাচ্ছে।

ও ডাকল মালীকে। এই শুনো—

—কিসকো চাহতে হেঁ?

—নেই নেই, একঠো ফুল দেগা মেহেরবানি করকে! বহুৎ জরুরী। এই লেও—

বলে একটা সিকি গুঁজে দিল ওর হাতে। লোকটা হতভম্ব। এদিক-ওদিক চেয়ে সিকিটা নিয়ে নিল। এবং একটার বদলে দুটো ফুল দিয়ে দিল।

আনন্দে লাফাতে লাফাতে গেট পেরিয়ে এল রণেন।

এসে দেখে, সোমা একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছে। ওরা ট্যাক্সিতে উঠল।

খুব যত্ন করে দুটো ফুলই খোঁপায় গেঁথে নিল সোমা। কদম এত ভারী হয়, একটু পরেই ঝুলে পড়বে। তবু, বেশ দেখাচ্ছে।

রণেন ফিসফিস করে বলে, সত্যি, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

—আঃ। সোমা চোখের ইশারায় সামনের সীটে বসা লোক দুজনকে দেখাল। ওরা শুনতে পাবে।

যখন পৌঁছল ওরা, তখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। এত এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি, খামখেয়ালিপনা করলে হবে না! তা হোক। ফুল আনার মজাটা মন্দ লাগে নি রণেনের। সোমাও খুশী হয়েছে খুব। খোঁপায় পরবে বলে ফুল নিয়ে এল রণেন, বেশ রোমাণ্টিক। তবে, পালিয়ে যাবার কথায় ওর মৌতাত ছিঁড়ে গেছে। পালানো ব্যাপারটাই ওর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়।

ছবি দেখতে-দেখতে এক সময় ও রণেনের হাতে চাপ দিল।

—এই শোন, একটা কথা তোমায় বলা হয় নি। প্রায়ই বলি-বলি করি, আর ভুলে যাই।

—এখন ছবি দেখ না, কথা-টথা পরে হবে।

—না, এখনই শোন। প্লীজ, না হলে আবার ভুলে যাব।

এতদিন পর সোমা সেই দাড়িওলা বুড়ো লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাগুলো রণেনকে গুছিয়ে বলল। যেচে এসে কথা বলা পর্যন্ত। তারপর জিগ্যেস করল, আচ্ছা, ফের যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়? আমি কিন্তু সোজাসুজি লোকজন জড়ো করব।

—বেশ তাই কর। রণেন থামিয়ে দেয়।

## ১৪

ছবি দেখে ওরা যখন বেরোল তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে।

তার মধ্যেই লোকেরা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। ট্রাম-বাস প্রায় বন্ধ। যাদের নিজেদের গাড়ি আছে, তারা অবলীলায় গিয়ে উঠে বসল—জোড়া-জোড়া। দাঁড়িয়ে রইল রণেন ও সোমার মতো মধ্যবিত্ত কয়েকজন।

একটা করে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে, আর ভিজতে-ভিজতে সবাই ছুটছে তার দিকে। এই সময়কার ট্যাক্সিগুলোর আবার নানান বায়নাক্কা—এ-দিকে যাবে না, ও-দিকে যাবে না।

বিরক্ত হয়ে রণেন চেষ্টা করা ছেড়ে দিল। বলল, একটু সবুর কর। ভিড় পাতলা হোক, তখন যাওয়া যাবে।

—কত রাত হয়ে গেল! সোমা অনুযোগ করে, মাথাটা আবার টিপটিপ করছে।

—করুক। রণেন জবাব দেয়, আমি দৌড়ঝাঁপ করতে পারব না আর।

বলে ও একটা সিগারেট ধরাল। এবং সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল, দিনের বেলার ঘটনা। না, মনে আগেই পড়েছে, এখন বলতে চাইল।

বলল, জানো, তোমার মামা কানপুর থেকে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছেন। শাড়িটাড়ি হবে। যেমন মাঝে-মাঝে পাঠান না...

—কই বলো নি তো?...তা, তুমি কি আপিসেই রেখে এলে ওটা?

—না না, ব্রীফ কেস-এ আছে। বার করতে ভুলে গেছি। বাড়ি ফিরেই যা সিনেমা দেখার তাড়া—রণেন বলল। তোমার মামার কর্মচারীরা তো প্রায়ই কাজে কলকাতায় আসে। খবরাখবর নিয়ে যায়।

সোমা জিগ্যেস করল, মামারা সব ভাল আছে তো?

—বলল তো লোকটা।

—তুমি বাড়ি আসতে বললে না কেন? নিজে আমি দুটো কথা বলতাম, দু-একটা জিনিস দিতাম।

—বললাম। ও বলল, সকালেই এসে পেঁৗছেছি, আবার সন্ধ্যেবেলার ট্রেনে ফিরতে হবে। আপিসপাড়ায় সারাদিন কাজ। তাই এখানে দিয়ে গেলাম। জিগ্যেস করল, আপনাদের খবরাখবর সব ভাল তো? ওঁকে কিছু বলার আছে?

বলে দিলাম, না, না, সব ভাল। লোকটা চলে গেল।—বলে রণেন চুপ করে গেল হঠাৎ।

যেমন শেষ পর্যন্ত কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না, আটকে থাকে না, জলের স্রোত হয়ে যায়, শীতের পর গ্রীষ্ম আসে, তেমনি এক সময়ে ওরাও ট্যাক্সি পেয়ে গেল একটা।

বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই সোমা বলল, দেখি, মামা কী পাঠিয়েছেন?

লোহার আলমারীর মাথা থেকে ব্রিফ কেসটা পাড়ল রণেন। মৌরীর নাগাল থেকে সরিয়ে রাখে ওটা। নইলে বোতাম টিপেটিপে খুলবে। আপিসের কাগজ-পত্র তছনছ করবে। খুলে মোড়কটা বার করে সোমার হাতে দিল।

সোমা খুলে দেখল, একটা শাড়ি, আর একটা সিল্কের ফ্রক।

রণেন বলল, আমার জন্যে কিছু আছে? নেই? তা থাকবে কেন, আমি তো চাকরবাকর লোক—

সোমা খুশী হয়েছে। বলল, হিংসে করো না। কী সুন্দর আঁচলটা দেখ, কাজ-করা।

কাপড়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে খোলতাই পরীক্ষা করল। বলল, মামাটা বড়ো ভাল, জান। মনে করে পাঠায় তো! উনি ছাড়া আমার বাপের বাড়ি বলতে যে কেউ নেই, তা জানেন। আমার বাবার অভাব মামাই অনেকটা পূরণ করেছেন।

সোমা গদ্‌গদ। আবার বলল, কালই একটা চিঠি লিখে দেব।

প্যাকেট আবার বেঁধে রাখতে গিয়ে ভাঁজ থেকে খসে পড়ল একটা কাগজ। চিঠি আছে।

খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা খুলল সোমা। তারপব দ্রুত পড়তে লাগল—

"সোমা মা—"

হাতের লেখাটা তো চেনা লাগছে না। তবে কি মামা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন? তবে কি মামার শরীর অসুস্থ? নিজে হাতে চিঠি লেখেন নি কেন? জানি না, কোনও দুঃসংবাদ আছে কি না এর মধ্যে।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে সোমা গড়গড় করে চিঠিটা পড়ে যায়:

"প্রায় এক বৎসরকাল ঘোরাঘুরির পর তোমার খোঁজ পাইয়াছিলাম। তুমি আমায় চিনতে পার নাই। পারার কথা না। তাহার পর প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছিলাম। মন বলিতেছিল, আত্মপ্রকাশ করো। আবার গৃহে ফিরিয়া যাও। অথচ, বুঝিলাম, তাহা সম্ভবপর নহে। এত কাল গত হইয়াছে, তোমাদের মনের মধ্যে নিশ্চিত আমার স্থান আর নাই। তবু তোমাদের দেখিয়া বড়ো তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায়, সব দুঃখ দুর্দশা অতিক্রম করিয়া তুমি সুখে সংসার করিতেছ। তোমাদের কল্যাণ হউক।......"

কে? কার চিঠি? সোমা অধীর হয়ে পাতা ওলটায়। বাকিটাও দ্রুত পড়ে শেষ করে:

"আমি চলিলাম। আমি যে বাঁচিয়া আছি, আজিও অপরাধের বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছি, এই কথা জানাইবার জন্য এই পত্র। জানি না, দুঃখের বোঝা পুনরায় চাপাইলাম কিনা। আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিয়ো।

ইতি—

আশীর্বাদক জ্যোতির্ময়"

পড়া শেষ হলে চিঠিটা রণেনের হাতে দিল সোমা। বসে পড়ল বিছানায়। কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে।

চিঠি পড়ে রণেন স্তম্ভিত। চিঠিটা হাতে নিয়েই ও বলল, তোমার বাবার চিঠি! তোমার বাবা এসেছিলেন!

সোমা জিগ্যেস করল, কেমন চেহারাটা? তুমি তো দেখেছ--

মুখে দাড়ি ছিল, বেশির ভাগ পাকা। পরনে ধুতি আর শার্ট। ঘাড় অবধি ঝোলানো উষ্কখুষ্ক চুল। রণেন আস্তে-আস্তে যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল, যার কথা তুমি বলছিলে খানিকক্ষণ আগে, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

—তুমি চিনতে পারলে না? সোমার গলা বুজে আসে।

—কী করে চিনব? তুমি তো কোনওদিন বল নি। আমি কী করে জানব, এত কাণ্ড হয়ে গেছে আগে—

—কতবার বলব ভেবেছি—আবার ভুলে গেছি। কে জানত, মানুষটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সোমা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। আবার কী মনে হতে হঠাৎ কেঁদে উঠল, বাবাকে তুমি কেন যেতে দিলে? একবার দেখতে দিলে না কেন? আমি ধরে রাখতাম। কিছুতেই যেতে দিতাম না।

হুহু করে কাঁদতে লাগল সোমা।

—আমি কী করে জানব বল! রণেন আবার বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু কিছুতেই ওকে থামানো যাচ্ছে না। সোমার মনে হচ্ছে, বুকের মধ্যেকার একটা পুরনো ক্ষত রণেন যেন নখ দিয়ে ছিঁড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে।

রণেন হতভম্ব; অথচ, ও বুঝতে পারছে, এ-কান্নার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। কোনও কান্নার পেছনেই কি যুক্তি বা বুদ্ধি কাজ করে? করে না।

ও কিছু বলল না আর। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবল, কাঁদুক, সোমা একটু কেঁদে নিক।